গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ১২ সংখ্যা | ১০ - ১৬ নভেম্বর ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

মৃত্যুশতবর্ষে

মহান লেনিনকে স্মরণ করব কেন

নেতা-কর্মীদের প্রতি সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে, মহান মার্কসবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক, রাশিয়ায় বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপকার এবং বিশ্বের সর্বহারা শ্রেণির শিক্ষক ও নেতা মহান লেনিন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন ১৯২৪ সালের ২১ জানুয়ারি। এই মহান চিন্তানায়কের মৃত্যুশতবর্ষ সমাপ্ত হবে ২০২৪ সালের ২১ জানুয়ারি।

আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ৭ নভেম্বর ২০২৩ থেকে ২১ জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মহান লেনিনের মৃত্যুশতবার্ষিকী উপযুক্ত মর্যাদায় আমরা পালন করব।

এই উদযাপন পর্বে আমাদের স্মরণ করা দরকার, রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির মধ্যে লেনিনই তীব্র আদর্শগত লড়াইয়ে মেনশেভিকদের পরাস্ত করে ইতিহাসের প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি বলশেভিক পার্টি গঠন করেছিলেন, যা প্রতিটি দেশে প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক দিকনির্দেশ হিসাবে কাজ করে।

লেনিনই 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'-এর শোধনবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে

চারের পাতায় দেখুন

নির্বাচনী বন্ড

তোলা সংগ্রহের অভিনব কল

নির্বাচনী বন্ডের আইনি বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে এক মামলা উপলক্ষে বিজেপির নির্বাচনী-দুনীর্তির যে বিরাট কারবারের কথা প্রকাশ্যে উঠে এল তা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে রীতিমতো নজিরবিহীন।

নির্বাচনে খরচ করার নামে পুঁজিপতি শ্রেণি তাদের অনুগত দলগুলিকে যে বিপুল পরিমাণ টাকা দেয় তাকে আইনের চোখে বৈধ হিসাবে দেখাতে বিজেপি সরকার নির্বাচনী বন্ড নামে এক অভিনব কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। ভোটে কালো টাকার খেলা বন্ধ করার কথা বলে ২০১৮-য় নির্বাচনী বন্ড চালু করে মোদি সরকার। এর ফলে কোনও ব্যক্তি বা কর্পোরেট সংস্থা রাজনৈতিক দলগুলিকে চাঁদা দিতে চাইলে বন্ড কিনে সংশ্লিষ্ট দলকে দিতে হবে। ১ হাজার, ১০ হাজার, ১ লক্ষ, ১০ লক্ষ এবং ১ কোটি টাকা মূল্যের বন্ড আছে। রাজনৈতিক দলগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে সেই বন্ড ভাঙিয়ে নিতে পারে। কিন্তু এই বন্ড কোন পুঁজিপতি কোন রাজনৈতিক দলকে দিচ্ছে এবং তা কত টাকার বন্ড, তা যাতে অন্য কেউ জানতে না পারে এই বন্ড সিস্টেমে তারও বন্দোবস্ত রয়েছে। এমনকী বন্ড ক্রেতা সংস্থাগুলোকেও এই দানের কোনও রকম হিসাব দিতে হয় না। অর্থাৎ আয়কর কর্তৃপক্ষ যাতে এ ব্যাপারে দাতাদের কোনও প্রশ্ন করতে না পারে, সরকার তারও ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এখানেই শেষ নয়, 'বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১০' সংশোধন

সাতের পাতায় দেখুন

প্যালেস্টাইনে গণহত্যা বন্ধ করো

অবিলম্বে প্যালেস্টাইনে সাম্রাজ্যবাদীদের মদতপুষ্ট ইজরায়েলি হানাদারি বন্ধের দাবিতে কলকাতায় বিক্ষোভ। ১ নভেম্বর

কমরেড রবীন মণ্ডলের জীবনাবসান

ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব, পরবর্তীকালে চাষি-মজুরের বহু দাবি আদায়ে সফল আন্দোলনের বলিষ্ঠ ও প্রবীণ নেতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা এস ইউ সি আই (সি)-র পূর্বতন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কমরেড রবীন মণ্ডল গত ১ নভেম্বর রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগণার নগেন্দ্রপুরের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি বেশ কয়েক বছর প্রায় শয্যাশায়ী ছিলেন।

মৃত্যুসংবাদ পেয়েই জেলা নেতারা তাঁর বাড়িতে পৌঁছন। জেলার সকল অফিসে পতাকা অর্ধনমিত করা হয়। কমরেডরা কালো ব্যাজ পরিধান করেন। পরদিন মরদেহ কলকাতায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের পক্ষে মাল্যদান করা হয়। পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু এবং উপস্থিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। কমরেড রবীন মণ্ডলের প্রবাদপ্রতিম সংগ্রামী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। এরপর তিন বারের নির্বাচিত বিধায়ক প্রয়াত নেতার মরদেহ বিধানসভায় নিয়ে যাওয়া হয়। বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সহ উপস্থিত বিধায়করা মাল্যদান করেন। সেখান থেকে মরদেহ জয়নগর অফিসে আনা হলে জেলা সাংগঠনিক কমিটিগুলি ও গণসংগঠন সমূহের পক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের পর তাঁর নিজ গ্রামে নিয়ে যাওয়ার সময় কৃষ্ণচন্দ্রপুর, রায়দিঘি

দুয়ের পাতায় দেখুন

টাটাদেরই উচিত সিঙ্গুরের চাষিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া

সিঙ্গুরে টাটাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া সংক্রান্ত ট্রাইবুনালের রায়ের তীব্র বিরোধিতা করে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

সিঙ্গুরে বহুফসলি জমিতে টাটার মোটর কারখানা গড়ার জন্য বিগত সিপিএম পরিচালিত সরকার যেভাবে গায়ের জোরে কৃষকদের জমি জবরদখল করতে চেয়েছিল তার বিরুদ্ধে 'সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটির' নেতৃত্বে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। রাজকুমার ভুলের মৃত্যু হয়, তাপসী মালিককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। সেই আন্দোলনের চাপে টাটা সিঙ্গুর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে হাইকোর্টও তৎকালীন রাজ্য সরকার কর্তৃক সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াকে অবৈধ বলে। সেই টাটাকে এমন কৃষকস্বার্থ বিরোধী কাজের জন্য কেন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। বরং টাটাদেরই উচিত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া

আমরা ট্রাইবুনালের এই রায়ের বিরোধিতা করছি।

কমরেড রবীন মণ্ডলের জীবনাবসান

একের পাতার পর

মোড়ে সাধারণ মানুষ এবং দলের কর্মী-সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পিত হয়।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ এ দেশে একটি সত্যিকারের চাষি-মজুর তথা শোষিত মানুষের দল গড়ে তুলতে যে অনন্যসাধারণ সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন, তার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র ছিল সুন্দরবন এলাকা। চরম বঞ্চিত এই এলাকার মানুষের মধ্যে অধিকারবোধ জাগ্রত করার সাথে সাথে শাসকদের শ্রেণিচরিত্র চেনানো এবং সরকার ও জোতদার-মহাজনের সম্মিলিত সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য আত্মত্যাগের মানসিকতা গড়ে তুলে যে দীর্ঘস্থায়ী গণপ্রতিরোধ দলের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল, সেই সংগ্রাম শুধু অত্যাচারী জমিদার-জোতদার-মহাজনদেরই পরাস্ত করেনি, গড়ে তুলেছিল এ দেশে সত্যিকারের বিপ্লবী কমিউনিস্ট দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর দৃঢ় সাংগঠনিক ভিত্তি, জনভিত্তি। গড়ে তুলেছিল কৃষক সংগ্রামের হাতিয়ার কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশন বা কে কে এম এফ— যা পরবর্তীকালে এ আই কে কে এম এস নামে পরিচিত হয়। এই সংগ্রাম গড়ে তুলতে দলকে বিরাট মূল্য দিতে হয়েছিল। নির্ভীক সেই লড়াই দমন করার জন্য পুলিশ-প্রশাসন, শাসক দল, সমাজবিরোধী ও জোতদার-মহাজন চক্র অত্যাচারের সমস্ত রকম পথ ও পদ্ধতিকে ব্যবহার করেছে। জমির ফসল লুঠ, জমি থেকে চাষিদের উচ্ছেদ, পুলিশি অত্যাচার, মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার, খুন, লাশ গায়েব করে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া, ঘর জ্বালানো, নির্মম নারী লাঞ্ছনা, ধর্ষণ— সমস্ত কিছুই দলের নেতৃত্বে অসীম বীরত্বের সাথে মোকাবিলা করেছে এলাকার মেহনতি মানুষ। এই লড়াই তাঁদের চরিত্রকে করেছিল ইস্পাতদৃঢ়, সৃষ্টি করেছিল এমন একদল নেতা-কর্মী যাঁরা মানবিকতায়, সংস্কৃতিতে, বিপ্লবী চরিত্রে অনন্য। সে দিন সহায়-সম্বলহীন এই দলের ডাকে বুক চিতিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার দুঃসাহস নিয়ে যে কয়েকজন নেতা এই জেলায় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রয়াত নেতা কমরেড রবীন মণ্ডল। বলা চলে সেই প্রথম যুগের বিশিষ্ট নেতাদের শেষ প্রতিনিধিকে আমরা হারালাম।

আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করতে জেলার বিশিষ্ট নেতা ও জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান পঞ্চম খণ্ডের বাজারে টিনের তৈরি চোঙের সাহায্যে বক্তব্য রাখার পর যারা আন্দোলন গড়ে তুলতে চান তারা নাম লেখান বলে আবেদন জানান। কৃষকদের পক্ষে এই আবেদনে সাড়া দিয়ে রবীনবাবু এগিয়ে এসে নাম লেখান। ইয়াকুব পৈলান তাঁকে দলের প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটবুরোর দুই সদস্য প্রয়াত কমরেড শচীন ব্যানার্জী ও কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর সংস্পর্শে নিয়ে আসেন। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ পরিচালিত শিক্ষাশিবিরে এসে ও তাঁর সাথে পরিচিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে দলের বৃহত্তর দায়িত্ব পালনে ব্রতী হন। কমরেড শচীন ব্যানার্জীর সুদক্ষ গাইডেন্সে তিনি কর্মী স্তর থেকে নেতৃত্বের স্তরে উন্নীত হন। দলের প্রথম পলিটবুরোর প্রয়াত সদস্য কমরেড প্রীতীশ চন্দ, হীরেন সরকার, তাপস দত্ত প্রমুখ নেতৃত্বের সক্রিয় সাহায্যে মেহনতি মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলন পুষ্ট হয়ে ওঠে। জেলার অন্যতম নেতা কমরেড ইয়াকুব পৈলান, রেণুপদ হালদার, আমির আলি হালদার, নলিনী প্রামাণিক প্রমুখ বিশিষ্ট নেতাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই লড়াই গড়ে ওঠে।

নদী-সমুদ্রের বেষ্টনী আর জঙ্গলে ঘেরা নোনা মাটির দেশ, দুর্গম ও পশ্চাদপদ বহু দ্বীপ সমন্বিত অঞ্চলগুলিতে চাষি আন্দোলন তথা দলকে জনভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে কমরেড রবীন মণ্ডল বলিষ্ঠ পদক্ষেপে যাত্রা শুরু করেন। পূর্বতন মথুরাপুর, বর্তমানে রায়দিঘি বিধানসভার অন্তর্গত অনেক অঞ্চল তৎকালীন পাথরপ্রতিমা বিধানসভা এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সাথে কুলতলীরও বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। ভয়ানক দারিদ্র্যপীড়িত, নিরক্ষর মানুষদের নিয়ে গ্রামের পর গ্রামে কমিটি গড়ে তুলে পুরুষদের সাথেই মা-বোনদের হাজারে-হাজারে সংগঠিত করে তোলেন।

চাষিদের পক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগণার মাটিতে ফসল ফলানো আর ঝড়-ঝঞ্ঝার হাত থেকে তা রক্ষা করা ছিল এক দুরূহ কাজ। ততোধিক কঠিন ছিল জমিদার, জোতদার, লটদার, ধনী চাষি আর মহাজনের কবল থেকে রক্ষা করে নিজেদের ঘাম-রক্ত ঝরানো চাষের ফসল নিজের ঘরে তুলতে পারা। জোতদার-ধনী চাষির নানা চক্রের ফাঁসে জড়িয়ে দিয়ে চাষিকে বাধ্য করা হত তার 'রক্তে বোনা ধান' প্রায় সবটাই জোতদার-মহাজনদের গোলায় তুলে দিতে। তাদেরই হাড়ভাঙা পরিশ্রমের বিনিময়ে জঙ্গল কেটে তৈরি করা আবাদযোগ্য জমিতে চাষের অধিকার কেড়ে নিত জোতদাররা। ঘরের মা-বোনদেরও নিরাপত্তা ছিল না। অথচ প্রতিবাদ করার এতটুকু জো ছিল না। জোতদার-মহাজনেরা মনেই করত 'এরা' হল 'পায়ের জুতো', মুখ বুজে তাদের পায়ের নিচেই থাকতে হবে। একদিকে শোষিত শ্রেণির মানুষের প্রতি দরদ ও মমত্ববোধ, অপর দিকে শোষক শ্রেণি তথা জোতদার-মহাজনদের অত্যাচার-অনাচারের প্রতি তীব্র ঘৃণা থেকে জীবনের পরোয়া না করে, দুরন্ত গতিতে এই আন্দোলনকে বলিষ্ঠ রূপ দিতে অগ্রণী ভূমিকা নেন কমরেড রবীন মণ্ডল। জোতদার-মহাজন চক্র এই আন্দোলন স্তব্ধ করতে সশস্ত্র আক্রমণ শানাতো। তা প্রতিরোধে লাঠি-বল্লম-সড়কি-তীরধনুক নিয়ে নিজেদের জীবন-জীবিকা-অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে বীরত্বের বহু কীর্তির জন্য তাঁকে মানুষ 'রবিনহুড' বলে সম্বোধন করতেন। বিগত শতাব্দীর '৬৭, ৬৯, '৭১ সালে তাঁরাই তাঁকে তিনবার বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত করেন। এমনকি কারাগারে বন্দি থাকাকালীনও তিনি বিধানসভায় নির্বাচিত হন। তৎকালীন অন্যান্য নেতাদের মতোই তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতো। সেই সময় গ্রামে গ্রামে পুলিশ আসছে দেখলে মা বোনেরা শাঁখ-কাঁসর-থালা-বাটি বাজিয়ে তাঁকে সতর্ক করে সরে যাওয়ার সুযোগ করে দিত। এমনকি কখনও মহিলাদের পোশাক পরিয়ে পুলিশের সামনে দিয়েই বের করে নিয়ে যেত। তাঁর আন্তরিক ব্যবহার, দায়িত্ববোধ, অকপট সরল কথা বলা ইত্যাদির জন্য মানুষ তাঁর মাধ্যমে দলের প্রতি আকৃষ্ট হত। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা মানুষের মধ্যে তুলে ধরার জন্য গ্রামের পর গ্রামে বৈঠক, গ্রুপ রিডিং, হাটসভা-পথসভা-জনসভা, রাজনৈতিক ক্লাস-শিক্ষাশিবির করাতেন। দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকাকালীন বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি ছুটে যেতে চাইতেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও কিছু ক্ষেত্রে তাঁকে সভায় কমরেডরা নিয়ে যেতেন। যখন দৃষ্টিশক্তি অনেকটা হারান, তখন অন্য কমরেডদের সাহায্য নিয়ে দলের মুখপত্র 'গণদাবী' ও অন্যান্য পুস্তিকা পাঠ শুনতেন। '৫৯-এর খাদ্য আন্দোলনের শহিদদের ও '৯০-এর গণআন্দোলনের শহিদ মাধাই হালদার স্মরণে ২০২১-এর ৩১ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগণার অতীতের গৌরবময় লড়াইয়ের স্মরণে 'চাষি মজুরের অন্তহীন সংগ্রামের কথা' পুস্তিকা প্রকাশের অনুষ্ঠান হয়। উদ্বোধন করেন দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। সেই সভার সভাপতি ছিলেন কমরেড রবীন মণ্ডল। গত বছর জুলাই মাসে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের স্মরণসভায় গুরুতর শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও উপস্থিত হয়েছিলেন। এই সভাতেও প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ।

শারীরিক দিক থেকে শেষজীবনে অক্ষম হয়ে পড়লেও দল সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি ছিল প্রখর। ২০২১ সালের ১১ জানুয়ারি জেলার অবিসংবাদিত সংগ্রামী জননেতা কমরেড আমির আলি হালদার সহ জেলার প্রায় দুই শত শহিদের স্মরণে অনুষ্ঠিত সভায় অসুস্থতার কারণে আসতে না পেরে তিনি লিখে পাঠিয়েছিলেন, 'আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা, এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক ও দার্শনিক, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের সান্নিধ্য যতটুকু পেয়েছি, হৃদয়ে কাঁপন ধরানো সে অনুভূতি আজও আমাকে ভাবায়-কাঁদায়। মনে তা উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাই যে কমরেডকে যখনই কাছে পাই, তাদের কাছে বলি তাঁর সেই সব মূল্যবান শিক্ষাগুলো। আমার বোঝাটা যতটুকু, ততটুকু বলি। কাজ করতে না পারার দুঃখ আমি অনেকটাই ভুলে যাই যাই গণদাবী বা দলের বইপত্রগুলো হাতে এলে। এক দিকে ক্রমাগতই রাজ্যের পর রাজ্যে সংগঠনের বিস্তার চলছে। চলছে সব সময়েই কোনও না কোনও আন্দোলন। ফলে কমরেডরা মার খাচ্ছেন, রক্ত ঝরাচ্ছেন, জেলে যাচ্ছেন, আগুনে ঘর পুড়ছে, মা-বোনেরা অত্যাচারিত, এমনকি শহিদ হচ্ছেন। তা সত্ত্বেও কমরেডরা ভয়ডরহীন ভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকছেন— তাতে বেদনার সাথে সাথে গৌরব অনুভব করি। অপর দিকে কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রয়াণ বুকে শেল হেনে গেলেও তাঁরই শিক্ষায় শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড নীহার মুখার্জী ও বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্যগুলি ও সুদক্ষ দল পরিচালনা আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছে। ... আজ মহান নেতার শিক্ষা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শোষিত শ্রেণিকে ভাবাচ্ছে, আলোড়িত করছে— জীবনে এ জিনিস দেখে শুনে যাওয়ার আনন্দই আলাদা।'

তাঁর জীবনসংগ্রাম ও দল সম্পর্কে গভীর অনুভূতি, দল তথা নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য আগামী দিনে কর্মীদের জীবনসংগ্রামে অনুপ্রেরণা জোগাবে। ২৫ নভেম্বর জয়নগরে শচীন ব্যানার্জী-সুবোধ ব্যানার্জী স্মরণে নির্মীয়মাণ ভবন সংলগ্ন ময়দানে তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকবেন দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ।

কমরেড রবীন মণ্ডল লাল সেলাম

এআইকেকেএমএস-এর ডাকে দিল্লিতে কৃষকদের ধরনা

ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার জন্য সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু, এমএসপি আইনসঙ্গত করা, নয়া বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহার, গ্রামীণ মজুরের সারা বছর কাজ ও ন্যায্য মজুরি, সস্তা দরে সার, বীজ, জ্বালানি তেল সরবরাহ সহ কৃষক জীবনের নানা সমস্যা সমাধানের দাবিতে ১ নভেম্বর এআইকেকেএমএস-এর ডাকে দিল্লির যন্তরমন্তরে কৃষকরা ধরনায় বসলেন। হরিয়ানা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম সহ দেশের নানা প্রান্ত থেকে সহস্রাধিক কৃষক অংশগ্রহণ করেছিলেন। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট কৃষক নেতা সংগঠনের সর্বভারতীয় সহসভাপতি কমরেড অনুপ সিং।

ধরনায় প্যালেস্টাইনে ইজরায়েলের বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে এক নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়াও নিউজক্লিকের ঘটনায় দিল্লির আন্দোলনকারী কৃষকদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কুৎসা রটনা ও আসামের ব্রহ্মপুত্র নদীর ভয়াবহ ভাঙনে লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষের সমস্যা প্রতিকারের দাবি জানিয়ে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি সংবলিত এক স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে প্রেরণ করা হয়।

উদ্বোধনী ভাষণে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ বলেন, এই সমাবেশের উদ্দেশ্য হল দেশব্যাপী কৃষকদের সমস্যা-সঙ্কটের কথা একচেটিয়া পুঁজিবাদের সেবাদাস বধির কেন্দ্রীয় সরকারের কানে পৌঁছে দেওয়া, কৃষক সংগ্রামের বার্তা দেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া। তিনি এসকেএম আহুত ২৬-২৮ নভেম্বরের কর্মসূচিকে সর্বাত্মক সফল করার জন্য আবেদন জানান। সংগঠনের সভাপতি কমরেড সত্যবান সহ নানা রাজ্যের কৃষক নেতারাও বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশে একটি সঠিক সাম্যবাদী দল গঠনের সংগ্রাম করছি আমরা

সাক্ষাৎকারে বাসদ মার্ক্সবাদীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক মাসুদ রানা

৫ আগস্ট মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে কলকাতায় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের সভায় যোগ দিতে এসেছিলেন বাংলাদেশের বাসদ মার্ক্সবাদীর এক প্রতিনিধিদল। দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানার একটি সাক্ষাৎকার গণদাবীর পক্ষ থেকে নেওয়া হয়। সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করা হল। এবার প্রথম কিস্তি।

প্রশ্ন ঃ কমরেড মাসুদ রানা, আপনারা ৫ আগস্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ব্রিগেড সমাবেশে যোগ দিতে ১১৫ জন ভারতবর্ষে এসেছেন। আপনারা এতজনকে নিয়ে এই সমাবেশে এলেন কেন?

উত্তর ঃ কমরেড শিবদাস ঘোষকে আমাদের দল আজকের যুগের একজন মার্ক্সবাদী অথরিটি মনে করে। অর্থাৎ লেনিন পরবর্তী যুগে মার্ক্সবাদের যে সংকটগুলো আমরা দেখি, লেনিনীয় শিক্ষার ভিত্তিতে সেই সংকটগুলোকে যথার্থ ভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা, দলীয় জীবনে রপ্ত করা, চর্চা করা এবং জীবন্তভাবে সেই সিদ্ধান্তগুলোকে উপস্থাপন করা, সেই বিষয়গুলোই কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় আমরা পাই। সেই জন্যই আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষকে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের একজন অথরিটি মনে করি। আমাদের দলের যিনি প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, মহান বিপ্লবী কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, তিনি শিবদাস ঘোষের সরাসরি ছাত্র ছিলেন। আমরা আমাদের দেশের মাটিতে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে একটি সঠিক সাম্যবাদী দল গড়ে তোলার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি ভিন্ন ধারার রাজনীতির চর্চা করছি। আমাদের দলের নেতা-কর্মীরা মনে করেন যে, এই মহতী সমাবেশে উপস্থিত থাকতে পারলে তাঁদের মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তার প্রতি আকর্ষণ বাড়বে, তাঁরা অনুপ্রাণিত হবেন।

প্রশ্ন ঃ এই ভিন্ন ধারার রাজনীতি বলতে কী বোঝায়?

উত্তর ঃ অবিভক্ত ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি এবং পরবর্তীকালে তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে মস্কোপন্থী এবং পিকিংপন্থী যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলো ছিল, তার থেকে পুরোপুরি নতুন একটি ধারারই সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে। আমাদের দেশে বিপ্লবের যে স্তর, আজকের দিনে উন্নত কিংবা অনুন্নত, যে কোনও দেশেই বিপ্লবটা সমাজতান্ত্রিক। আমাদের দেশে বিপ্লবের স্তর পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক, এ কথা কিন্তু কেউ বলত না। আমাদের পার্টি, আমাদের পার্টির নেতা সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে দেখান যে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশ একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিক এবং জাসদের (জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল) অভ্যন্তরে যে সংগ্রামটা শুরু হয়েছিল, সেই জাসদের সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, তারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের স্লোগান দিয়েছিল, কিন্তু তার বিপ্লবের রণনীতি কী হবে, তার রণকৌশল কী হবে, বিপ্লবের স্তর কী হবে, সে সম্পর্কে তাদের কোনও স্পষ্ট দিকনির্দেশ ছিল না। আবার শুধু মাত্র বিপ্লবের স্তর নির্ধারণই নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্র ব্যাপ্ত করে তার সংগ্রামটা কেমন হবে, এই বিষয়গুলো কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতেই কিন্তু আমাদের দেশে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীই প্রথম তুলে ধরেন এবং সেই সংগ্রামটা শুরু করেন।

ফলে মার্কসীয় জ্ঞানভাণ্ডারে শিবদাস ঘোষের যে অবদান, সেগুলো আমরা যখন আলোচনা করি, তখন দেখি যে, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সংকটগুলো কী এবং সেই সংকটগুলো কেন হচ্ছে, এই বিষয়গুলো উনি পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন। যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতির মোকাবিলা করছে, যখন সমাজতন্ত্রের একটা ব্যাপক জোয়ার, তখন উনি আদর্শগত চর্চার যে গুরুত্ব বা যান্ত্রিকতার যে সমস্যা, সেইগুলোকে তুলে ধরছেন। বা পরবর্তী সময়ে আমরা দেখি যে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের রিপোর্টের যে আলোচনা উনি করলেন তখন দেখালেন যে এই কংগ্রেস কী ভাবে শোধনবাদের দ্বার উন্মোচিত করছে। বা স্ট্যালিনকে যখন কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে তখন তার বিরুদ্ধে উনি দাঁড়াচ্ছেন। ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে আলোচনাতেও কিন্তু শিবদাস ঘোষ দেখালেন যে এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ফ্যাসিবাদের আর একটা নতুন রূপ, যা আমাদের দেশের পরিস্থিতি আলোচনা করতে গেলে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি। এই আলোচনাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এর সাথে যুক্ত করে আমরা যা বলছি, তা হল, নিজেদের জীবনে এই সব তত্ত্বের প্র্যাকটিসটা কেমন হচ্ছে? এই প্রশ্নটা আজকের দিনের বিপ্লবী রাজনীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খুব জরুরি। আমরাও আমাদের দল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দেখেছি, আজকের দিনে ব্যক্তিবাদের যে সঙ্কট, দল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যৌথ নেতৃত্বের নীতি যদি অনুসরণ না করা হয়, একটা দলের মধ্যে একটা জীবন্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নেতা-কর্মীদের আদর্শগত চর্চার মধ্যে দিয়ে একটা যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার সংগ্রাম করা না হয়, তা হলে ব্যক্তিবাদকে কেন্দ্র করে দলে একটা ভয়াবহ সঙ্কট তৈরি হয়। এই জায়গা থেকে আমরা মনে করি, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা আমরা আমাদের দলে যতটুকু চর্চা করতে পেরেছি সেটা দলীয় জীবনে আমাদের যেমন সহযোগিতা করে, তেমনই আবার আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও কমিউনিস্ট হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য আমাদের নিজেদের যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামটাকেও তা প্রভাবিত করে।

আর বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষের ভূমিকা ও অবদান তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দল ওনাকে সাম্যবাদী আন্দোলনের একজন অথরিটি মনে করে। এই বিষয় নিয়ে আমাদের দলের মধ্যে বিতর্ক হয়েছে বহু সময়েই, বিশেষ করে ২০১৩ সালে। সেই সময়ে দলের প্রতিষ্ঠাকালীন নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধেও আমরা সংগ্রাম করেছি। এই অবস্থান থেকে আমরা মনে করি কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষের এই যে আয়োজন তা খুবই প্রয়োজনীয় এবং সে জন্যই আমরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছি।

প্রশ্ন ঃ কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা আপনারা যখন জনসাধারণের মধ্যে নিয়ে যান, তখন কী রকম সাড়া পান?

উত্তর ঃ এটার একটা জীবন্ত প্রমাণ যদি আমরা বলি, তা হলে আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর জায়গা থেকে যদি আমরা দেখি, কারণ মুবিনুল হায়দার চৌধুরী কিন্তু আমাদের দেশে প্রধান নেতা ছিলেন না কখনও, জাসদে তো উনি কোনও পদেই ছিলেন না। বাসদেও উনি দলের প্রধান নেতা ছিলেন না, কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। কিন্তু জাসদের অভ্যন্তরে মতাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীকেই সবাই মনে করতেন উনিই আদর্শগত নেতা। বাসদের সবাই মনে করতেন যে আমরা যে আদর্শগত সংগ্রাম করছি, সেই সংগ্রামের নেপথ্য নায়ক হলেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী।

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন বিশ্ব জুড়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে ভয়াবহ সংকট তৈরি করেছিল, তার প্রভাব আমাদের দেশের বামপন্থী আন্দোলনেও সঙ্কট তৈরি করেছিল। অথচ তখন আমাদের দলে হাজার হাজার যুবক-যুবতী এসেছেন, ঘর ছেড়েছেন, দলকেন্দ্রিক জীবনকেই তাঁরা গ্রহণ করবেন, এই জীবনের আহ্বানেই ঘর ছেড়েছেন। এই আকর্ষণটা কিন্তু কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী তৈরি করতে পেরেছিলেন এবং সেটা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে। এই জায়গাটা আমরা মনে করি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের দলের ক্ষেত্রে। অপরাপর বামপন্থী দলগুলো প্রত্যেকেই আমাদের দলের এই সংগ্রামটাকে স্বীকৃতি দেয়। আমাদের দলে এই যে ক্যাডার ভিত্তিক দলকেন্দ্রিক জীবন, বিপ্লবের জন্য একনিষ্ঠ কর্মী গড়ে তোলা, এই চর্চাটা আমাদের দলেই হয়, এটা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে আমরা করতে পারি। এমন ধারার জীবনসংগ্রামের একটা প্রবল আকর্ষণ আছে এটাও আমরা খেয়াল করি। এখন সেটা আমরা আরও ভাল ভাবে খেয়াল করছি। আমাদের দলে সেই অর্থে প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব নেই, খুব পরিচিত নেতৃত্ব নেই। তা সত্ত্বেও প্রচুর ছেলেমেয়ে আমাদের দলের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর জীবনসংগ্রামের কথা যতটুকু আমরা নিয়ে যেতে পারছি, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা আমরা যতটুকু নিয়ে যেতে পারছি, আমরা দেখছি তা একটা প্রবল আকর্ষণ তৈরি করতে পারছে।

প্রশ্ন ঃ অর্থাৎ দলের বাইরেও জনসাধারণের মধ্যে, ছাত্র-যুবদের মধ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাটা যখন আপনারা নিয়ে যাচ্ছেন, তখন কি সেটা একটা আকর্ষণ তৈরি করছে?

উত্তর ঃ বিশাল আকর্ষণ তৈরি করছে এবং বাংলদেশে বিশেষ করে আমরা যদি বলি, আমরা একটা জায়গা তৈরি করতে পারছি, ইউনিক একটা জায়গা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের এই স্বীকৃতি আছে যে শিক্ষা আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের বক্তব্য ইউনিক। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের যে বক্তব্য, সেটার যে গ্রহণযোগ্যতা তা প্রত্যেকের কাছে আছে। এই গ্রহণযোগ্যতার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের দেশের অন্যান্য বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির সঙ্গে একটা ছেদ আনতে পেরেছি। তা কিন্তু আমরা পেরেছি কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা সম্পর্কিত যে দৃষ্টিভঙ্গি তার আলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়েই। নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত তাঁর আলোচনাগুলো যখন আমরা সাধারণ মানুষের মধ্যে নিয়ে যাই, তা তাদের মধ্যে যথেষ্ট আকর্ষণ তৈরি করে এবং এগুলোর একটা স্বীকৃতি আছে।

(বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি বিষয়ে সাক্ষাৎকারের শেষাংশ পরবর্তী সংখ্যায়)

যুদ্ধবিরোধী মিছিলে সামিল শিশু-কিশোররাও

এসইউসিআই(সি)-র কিশোর বাহিনী কমসোমলের উদ্যোগে কোচবিহারের মাথাভাঙায় ৪-৫ নভেম্বর শিক্ষাশিবির হয়। গাজায় ইজরায়েলি হামলা বন্ধের দাবিতে শহরে মিছিল করেন কিশোর-কিশোরীরা। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য ইনচার্জ সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী, জেলা ইনচার্জ বৈশাখী নন্দী প্রমুখ। দ্বিতীয় দিন পিটি-প্যারেডের পর নির্বাচিত ৪টি প্রশ্নের উপর আলোচনা চলে এবং শেষে বিস্তারিত আলোচনা করেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অনুরূপা দাস। উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড শিশির সরকার, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অসিত বরণ দে। শিবিরের শেষে সম্পা বর্মনকে ইনচার্জ করে জেলা সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়।

জেলায় জেলায় বিদ্যুৎ গ্রাহক কনভেনশন

বিদ্যুৎ পরিষেবার সর্বনাশ করে আচমকা সর্বস্তরের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর ফিক্সড চার্জ, মিনিমাম চার্জ, ডিসি-আরসি চার্জ কয়েকগুণ বাড়ানো, ক্ষুদ্র শিল্প ও কৃষি গ্রাহকদের উপর নতুন করে প্রতি কেভিতে মিনিমাম চার্জ বাড়িয়ে ২০০ টাকা ও ৭৫ টাকা করার এবং দানবীয় স্মার্ট মিটারের আক্রমণ রুখতে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে জেলায় জেলায় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কনভেনশন হয় ৩০ অক্টোবর। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ শিক্ষক ও অ্যাবেকার জেলা সহসভাপতি দোলগোবিন্দ রক্ষিত। শতাধিক ক্ষুদ্রশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা, গৃহস্থ ও কৃষি বিদ্যুৎগ্রাহক উপস্থিত ছিলেন। জেলার বিশিষ্ট চিকিৎসক, অধ্যাপক, অ্যাডভোকেট, শিক্ষক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ধানকল, গমকল, তেলকল, লেদ, গ্রিল কারখানার গ্রাহকরা তাদের অসহনীয় অবস্থা তুলে ধরেন। প্রধান বক্তা ছিলেন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি অনুকূল ভদ্র। কনভেনশনে আগামী ২০ নভেম্বর জেলাশাসকের দফতরে আইন অমান্যের কর্মসূচি ঘোষিত হয়।

শিলিগুড়ির কনভেনশনে বক্তব্য রাখছেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস

শিলিগুড়িঃ ২ নভেম্বর অধিকারী পিডব্লিউডি মোড় কমিউনিটি হলে খড়িবাড়ি-নকশালবাড়ি ব্লকের বিদ্যুৎ গ্রাহক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। তিন শতাধিক গ্রাহকের উপস্থিতিতে কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন অ্যাবেকার রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস।

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে এই ব্যাপক আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি। কনভেনশনে বিশ্বজিত দত্ত ও রঞ্জিত বাড়েকে যুগ্ম সম্পাদক ও লক্ষ্মণ সিংকে সভাপতি করে ব্লক বিদ্যুৎ গ্রাহক কমিটি তৈরি হয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক প্রণব সরকার, সহসভাপতি শ্যামল সিনহা, তন্ময় দত্ত, জয়ন্তী ভট্টাচার্য, হরিকিশোর রায়, কৌশিক দত্ত প্রমুখ নেতৃত্ব।

হাসপাতাল উন্নয়নের দাবিতে
আসামে অনশন আন্দোলন

আসামের নলবাড়িতে শহিদ মুকুন্দ কাকতি সিভিল হাসপাতালের সঠিক পরিষেবার দাবিতে দীর্ঘ ৮ মাস ধরে আন্দোলন চলছে। ৩০ অক্টোবর ২৪ ঘন্টা অনশন কর্মসূচি পালন করে শহিদ মুকুন্দ কাকতি অসামরিক চিকিৎসালয় সুরক্ষা সমিতি। হাসপাতালটির জীর্ণ দশার কারণে নলবাড়ি জেলার লক্ষ লক্ষ মানুষ চরম দুর্ভোগে। সরকার এই জায়গায় একটি ৫০ শয্যার হাসপাতাল চালু করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু এলাকার মানুষ আগের মতো ২৩৫ শয্যার হাসপাতালের দাবিতে অটল। সেই দাবিতে এ দিন ভুপেন হাজারিকা শিশু উদ্যানের সামনে ২৪ ঘন্টার অনশন ধর্মঘটে বহু মানুষ অংশ নেন।

শুরুতেই বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক রমণী বর্মন। উপস্থিত ছিলেন সমিতির সম্পাদক জিতেন্দ্র কুমার জৈন, সভাপতি ডঃ নারায়ণ চন্দ্র শর্মা, উপসভাপতি জ্ঞানেন চক্রবর্তী সহ সমিতির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং ছাত্র, যুবক ও মহিলারা। অংশ নেন এলাকার বিশিষ্টজনেরাও। নলবাড়ির বাসিন্দারা এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান।

পুলিশি হয়রানি বন্ধ, পরিবহণ শ্রমিকের স্বীকৃতির দাবিতে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরে ১৩ অক্টোবর সারা বাংলা ই-রিক্সা (টোটো) চালক ইউনিয়নের বিক্ষোভ এবং এসডিও ও থানায় ডেপুটেশন

কমরেড প্রভাস ঘোষের আহ্বান

একের পাতার পর

বিরামহীন আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে মার্ক্সবাদের বিপ্লবী মর্মবস্তুকে রক্ষা করেছেন।

লেনিনই ইতিহাসে প্রথম সফল সর্বহারা বিপ্লব করেছিলেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ঔপনিবেশিক দেশগুলির মুক্তির জন্য জাতিগঠনের আদর্শগত তাত্ত্বিক ভিত্তি দেন এবং প্রতিটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ধারণা স্পষ্ট করে উপনিবেশগুলির মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করেন।

লেনিনই হচ্ছেন সেই চিন্তানায়ক যিনি বুর্জোয়া আদর্শ, রাশিয়ার মেনশেভিকবাদ এবং 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'-এর শোধনবাদী বিকৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে মার্ক্সবাদকে দর্শনগত, আদর্শগত, রাজনীতিগত ও সংগঠনগত ভাবে বিকশিত করেন এবং এর মধ্য দিয়ে মার্ক্সবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে মৌলিক অবদান রাখেন। লেনিনই পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে মার্ক্সীয় বিশ্লেষণ উপস্থিত করেন। মহান স্ট্যালিন বলেছেন, লেনিনবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগের মার্ক্সবাদ।

লেনিনের মূল শিক্ষাগুলির আধারে কমরেড স্ট্যালিন, কমরেড মাও সে তুং এবং কমরেড শিবদাস ঘোষ লেনিনের ছাত্র হিসাবে সমসাময়িক সমস্যাগুলির মোকাবিলার জন্য মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে কতদূর এবং কী ভাবে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেছেন, শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আমাদের সেগুলিও স্মরণ করতে হবে।

মহান লেনিনকে স্মরণ করা ও শ্রদ্ধা জানানোর প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে, মহান মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং ও শিবদাস ঘোষের যোগ্য ছাত্রের স্তরে নিজেদের উন্নীত করে লেনিনের আন্তর্জাতিকতাবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের লক্ষ্যপূরণের পথে অগ্রসর হওয়া।

প্রিয় কমরেড, এ কথা দুঃখের যে, আমরা যখন লেনিন মৃত্যুশতবর্ষ উদযাপন করছি, তখন রাশিয়া, চিন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে বাইরের ও ভিতরের বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবীদের ষড়যন্ত্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। এর পরিণামে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার গৌরবময় অগ্রগতি, শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামগুলি যা একসময় সাম্রাজ্যবাদীদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল, আজ তা অনুপস্থিত।

তা সত্ত্বেও, আমরা লক্ষ না করে পারি না যে, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ আজ ক্রমবর্ধমান সংকটের আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে হাঁসফাঁস করছে। যে কথা লেনিন আগেই বলেছিলেন— সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে পুঁজিবাদের মুমূর্ষু স্তর। বস্তুত বিশ্বপুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা আজ অন্তহীন মন্দার কবলে পড়েছে, যাকে তারা মধুর ভাষায় নাম দিয়েছে 'অর্থনীতির শ্লথগতি'। এটা ঘটছে জনগণের ক্রয়ক্ষমতার ক্রমাগত সংকোচনের দ্বারা, যা শেষপর্যন্ত বাজারের সংকোচন ঘটাচ্ছে। এর হাত থেকে বাঁচার ব্যর্থ চেষ্টায় বহুজাতিক পুঁজি, একচেটিয়া পুঁজিপতিরা হাজার হাজার শিল্প-কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে, কোটি কোটি শ্রমিককে ছাঁটাই করছে, স্থায়ী কাজের পরিবর্তে নামমাত্র মজুরিতে অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করছে, কাজ আউটসোর্স করছে এমনকি বন্ডেড লেবার প্রথা ফিরিয়ে এনেছে। তদুপরি কৃত্রিম বাজার সৃষ্টির জন্য ক্রমাগত অর্থনীতির সামরিকীকরণ করছে, যে বিষয়ে মহান স্ট্যালিন দীর্ঘকাল আগে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছিলেন। অস্ত্রের বাজার রক্ষা ও প্রসারের জন্য তাদের প্রয়োজন যুদ্ধ-উত্তেজনা তৈরি করা এবং বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ বাধানো। বর্তমানে ইউক্রেনে সাম্রাজ্যবাদী চিনের প্রচ্ছন্ন মদতপুষ্ট সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার আক্রমণ এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ন্যাটোভুক্ত দেশগুলির সক্রিয়তা, মার্কিন ও তার সহযোগী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রত্যক্ষ মদতে প্যালেস্টাইনে ইজরায়েলের আক্রমণ, যার ফলে শিশু-নারী সহ হাজার হাজার মানুষ নিহত হচ্ছে, শহর-গ্রাম-বাড়িঘর-বিদ্যালয়-হাসপাতাল ধ্বংস করা হচ্ছে। এসবই— 'সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের জন্ম দেয়'— লেনিনের এই সুগভীর সিদ্ধান্তকে আবার সত্য প্রমাণ করছে।

কিন্তু সবটাই অন্ধকার নয়। সকল সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশেই শ্রমিকদের, কৃষকদের, ছাত্র-যুবদের, নারীদের আন্দোলন ক্রমাগত ফেটে পড়ছে, সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্ত যুদ্ধবিরোধী শান্তি মিছিলও দীর্ঘ হচ্ছে। ফ্যাসিবাদী শাসকরা যতই দমন করতে চাইছে ততই আন্দোলন তীব্রতর হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান সমস্যা মানুষের জীবনকে অসহনীয় করে তুলছে। মানুষ পরিবর্তন চায় কিন্তু পরিবর্তনের রাস্তা তার জানা নেই। এ ভাবেই বাস্তবে বিপ্লবের অবজেকটিভ কন্ডিশন বা বাস্তব পরিস্থিতি তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু নেই বিপ্লবের জন্য আদর্শগত প্রস্তুতি।

বর্তমান সময়ের প্রধান কাজ হচ্ছে সব দেশেই যত দ্রুত সম্ভব যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা। এই সময়ের অন্যতম কর্তব্য হবে, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও তার পরবর্তী বিকশিত চিন্তা যা স্ট্যালিন, মাও সে তুং ও বিশেষ করে শিবদাস ঘোষ দিয়েছেন, তাকে অধ্যয়ন করা ও আত্মস্থ করা।

এই সময়ে আমাদের বুঝতে হবে, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী আদর্শগত, সংগঠনগত ও নৈতিক ভাবে আরও নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার সাথে এবং নির্ভীক মনোভাব নিয়ে নিজেদের তৈরি করা, যাতে আমরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক ভূমিকা যথাযথ ভাবে পালন করতে পারি। এই উপলক্ষে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি সমস্ত রাজ্য কমিটিগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে নিম্নোক্ত কর্মসূচি রূপায়ণ করার আবেদন জানাচ্ছে ঃ

কর্মসূচি

১) সারা দেশে একেবারে নিম্ন স্তর পর্যন্ত ব্যাপকভাবে মহান লেনিনের উদ্ধৃতি প্রদর্শনী সংগঠিত করতে হবে।

২) মহান লেনিনের শিক্ষা সাধারণ মানুষের মধ্যে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে জনসভা, পথসভা এবং গ্রুপ সিটিং করতে হবে।

৩) কমরেডদের নিজেদের আদর্শগত মান বাড়ানোর জন্য লেনিনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখা পড়তে হবে, বিশেষ করে 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' বইটি পড়তে হবে ব্যক্তিগতভাবে ও সম্মিলিতভাবে।

৪) পার্টির প্রত্যেক রাজ্য, জেলা এবং লোকাল কমিটিগুলিকে দলের বইপত্র বিক্রির উদ্দেশ্যে ব্যাপক এবং পরিকল্পিত কর্মসূচি নিতে হবে।

৫) পার্টির সমস্ত রাজ্য কমিটি এবং ফ্রন্ট ও ফোরামগুলিকে দেখতে হবে যাতে ৫ আগস্ট ও অন্যান্য সাম্প্রতিক কর্মসূচিতে যে সমস্ত যোগাযোগ পাওয়া গিয়েছে, তাঁদের সকলকে লেনিন মৃত্যুশতবার্ষিকী কর্মসূচিতে যুক্ত করা যায়।

মহান লেনিন জিন্দাবাদ!
মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা জিন্দাবাদ!
লেনিন-মশাল হাতে এগিয়ে চলুন!

বিপ্লবী অভিনন্দন সহ
প্রভাস ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক

রাষ্ট্র ও বিপ্লব

‘সশস্ত্র বিপ্লব’ ও রাষ্ট্রের ‘বিলুপ্তি’

(৩)

এ বছরটি বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও রুশ বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ। এই উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে বর্ষব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে গণদাবীতে তাঁর ‘রাষ্ট্র ও বিপ্লব’ রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। এবার তৃতীয় কিস্তি।

রাষ্ট্রের ‘বিলুপ্তি’ সম্পর্কে এঙ্গেলসের বক্তব্য সবাই জানে। প্রায়শই তা বিভিন্ন জায়গায় উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহারও করা হয়। মার্ক্সবাদের মূল কথাটিকে সুবিধাবাদ হিসেবে চালাবার প্রচলিত কারচুপিটি তার দ্বারা এতটাই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, যে তা নিয়ে একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। কথাটি যেখান থেকে নেওয়া হয়েছে তার পুরো বক্তব্যটা আমরা তুলে দিচ্ছি ঃ

‘সর্বহারাশ্রেণি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে প্রথমেই উৎপাদনের উপায়গুলিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে। কিন্তু তার মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণি, শ্রেণি হিসেবে তার নিজেরও বিলুপ্তি ঘটায়, সেই সাথে সমস্ত শ্রেণি বৈষম্য ও শ্রেণি বিরোধেরও অবসান ঘটায়, রাষ্ট্র হিসেবে রাষ্ট্রকেও বিলুপ্ত করে। এতদিন পর্যন্ত সমাজ শ্রেণি বিরোধের মধ্য দিয়েই পরিচালিত হয়েছে। এই সমাজে রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয়েছে নির্দিষ্ট শোষক শ্রেণিটির আবশ্যিক সংগঠন হিসেবে, উৎপাদনের বাহ্যিক শর্তগুলিকে বজায় রাখতে এবং বিশেষত সেই নির্দিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারা নিরূপিত শোষিত শ্রেণিকে গায়ের জোরে দমন করে ওই শোষণ প্রক্রিয়াটি (দাসব্যবস্থা, ভূমিদাসপ্রথা বা মজুরিভিত্তিক শ্রমব্যবস্থা) বজায় রাখার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ, রাষ্ট্র হল সরকারিভাবে গোটা সমাজেরই প্রতিনিধি, একটি দৃশ্যগোচর সংস্থায় যার পুঞ্জীভূত প্রতিফলন ঘটে। কিন্তু যে শ্রেণি তার যুগে নিজেই গোটা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে, রাষ্ট্র ছিল যে-পরিমাণে সেই শ্রেণিরই রাষ্ট্র, সেই-পরিমাণেই অবশ্য রাষ্ট্রকে গোটা সমাজের সরকারি প্রতিনিধি বলা চলত— প্রাচীনকালে তা ছিল দাস মালিকদের রাষ্ট্র, মধ্যযুগে সামন্তী প্রভুদের এবং আমাদের সময়ে পুঁজিপতি শ্রেণির বা বুর্জোয়াদের। কিন্তু যখন শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র সত্যি সত্যিই গোটা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করবে, রাষ্ট্র হিসেবে তখন তার প্রয়োজনই ফুরিয়ে যাবে। যখন দমিয়ে রাখা হয়েছে এমন কোনও শ্রেণি আর থাকবে না, যখন শ্রেণি শাসনের অবসান ঘটে যাবে এবং আজকের উৎপাদন ব্যবস্থায় নৈরাজ্য থেকে জন্ম নেওয়া ব্যক্তির অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামের ফলে সৃষ্ট সংঘর্ষ ও অমিতাচারের যখন নিরসন ঘটবে, সমাজে দমন করার মতো কোনও কিছুই তখন আর থাকবে না। ফলে দমন করার শক্তি হিসেবে রাষ্ট্রেরও প্রয়োজনীয়তা তখন ফুরিয়ে যাবে। গোটা সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রের প্রথম কাজ হল সমাজের নামে উৎপাদনের উপকরণগুলির দখল নেওয়া, আবার এটাই রাষ্ট্র হিসেবে রাষ্ট্রের শেষ স্বাধীন কাজ। সামাজিক সম্পর্কের বিষয়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা তখন একটার পর একটা ক্ষেত্রে অনাবশ্যক হয়ে পড়বে এবং নিজে থেকেই তখন তা অবলুপ্ত হয়ে যাবে। ব্যক্তির উপর শাসন বলবৎ রাখার বদলে তখন প্রশাসনের মূল কাজ দাঁড়াবে প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিচালনা। মানে রাষ্ট্রকে উৎখাত করা হয় না, ক্ষয় পেতে পেতে তার বিলুপ্তি ঘটে। ‘স্বাধীন গণরাষ্ট্র’ এই কথাটির অর্থ এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদের বুঝতে হবে। সাময়িক ভিত্তিতে প্রচারমূলক দিক থেকে এর কিছু মূল্য থাকলেও, শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যে এই ধারণা অচল, সেটাও বুঝতে হবে এই দৃষ্টিকোণ থেকে। তথাকথিত নৈরাজ্যবাদীরা যে রাষ্ট্রকে রাতারাতি উচ্ছেদ করার ডাক দিয়ে থাকেন— এই দাবিরও বিচার করতে হবে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই। (হের অয়গেন ড্যুরিং-এর বিজ্ঞানে বিপ্লব (অ্যান্টি-ড্যুরিং), পৃঃ ৩০১-৩০৩, ৩য় জার্মান সংস্করণ)

এঙ্গেলসের এই অসাধারণ সমৃদ্ধ চিন্তা সংবলিত বক্তব্য সম্পর্কে এটুকু বলা নিরাপদ যে, এর মধ্যে থেকে যে বিষয়টি আধুনিক সমাজতান্ত্রিক দলগুলির সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত ধারণার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে পড়েছে— তা হল মার্ক্সের মতে রাষ্ট্রের ‘বিলুপ্তি’ ঘটবে, তা, নৈরাজ্যবাদীরা যে বলে থাকে রাষ্ট্রকেই ‘উৎখাত’ করতে হবে, তার থেকে পৃথক ধারণা। মার্ক্সবাদকে কেটেছেঁটে নিয়ে এইরকমের কোনও ব্যাখ্যার অবতারণা করা মানে তাকে সুবিধাবাদে পর্যবসিত করা। কেন না এই ব্যাখ্যার ফলে যা পড়ে থাকে তা হল উলম্ফন, ঝঞ্ঝা এবং বিপ্লব ছাড়াই সমাজের কেবল ধীরগতিতে সমহারে পরিবর্তনের একটা ঝাপসা ধারণা। রাষ্ট্রের ‘বিলুপ্তি’র যে বর্তমান বহুপ্রচলিত ধারণাটি আজ জনপ্রিয়, বাস্তবে বিপ্লবের কথা পুরোপুরি নাকচ না করলেও এক অর্থে তাকে ধামাচাপা দেয়।

এ রকম ব্যাখ্যা আসলে মার্ক্সবাদের অতি স্থূল বিকৃতি। যার ফলে একমাত্র বুর্জোয়াদেরই সুবিধা হয়। তত্ত্বের দিক থেকে বলতে হয়, এঙ্গেলসের রচনা থেকে যে অনুচ্ছেদ আমরা পুরোপুরি উদ্ধৃত করেছি তার মধ্যে এঙ্গেলসের বক্তব্য ‘সংক্ষেপে’ বিবৃত হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে যে-সব গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি ও বিষয়গুলি বিবেচনার কথা সংক্ষেপে তুলে ধরেছে, তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেই একমাত্র এইরকম কোনও ব্যাখ্যায় উপনীত হওয়া সম্ভব।

তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই এঙ্গেলস বলেছেন, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণি ‘রাষ্ট্র’ হিসেবে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটায়’। এর অর্থ কী, তা নিয়ে ভাবা হয় না। হয় বক্তব্যের এই অংশটিকে উপেক্ষা করে যাওয়া হয়, নতুবা ভাবা হয় এটা বোধহয় এঙ্গেলসের দিক থেকে কোনও ‘হেগেলীয় দুর্বলতার’ নিদর্শন। আসলে কিন্তু এই কথাগুলির মধ্য দিয়ে সংক্ষেপে বেরিয়ে এসেছে মহত্তম এক সর্বহারা বিপ্লবের অভিজ্ঞতার কথা, ১৮৭১ সালের প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতার কথা। পরে উপযুক্ত স্থানে এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করা যাবে। বাস্তবে এখানে এঙ্গেলস বলেছেন, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের উচ্ছেদ ঘটায়। অন্য দিকে, যে রাষ্ট্রের ‘বিলুপ্তি’র কথা বলা হয়েছে তা হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে সর্বহারা শ্রেণি রাষ্ট্রের অবশেষটুকু। এঙ্গেলসের মতে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ‘বিলুপ্তি’ ঘটে না, তাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে উচ্ছেদ করতে হয়। বিপ্লবের পরে ক্ষয় পেতে পেতে যা বিলুপ্ত হয়ে পড়ে, তা হচ্ছে সর্বহারা রাষ্ট্র বা আধা-রাষ্ট্র।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র হল এক বিশেষ ‘দমনমূলক’ শক্তি। এঙ্গেলস এখানে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে রাষ্ট্রের এক অত্যন্ত গভীর ও চমৎকার সংজ্ঞা উপস্থাপিত করেছেন। এর মানে দাঁড়ায় এই যে, বুর্জোয়াদের হাতে সর্বহারা শ্রেণিকে দমনের যে ‘দমনমূলক’ ব্যবস্থা, মুষ্টিমেয় ধনীর হাতে কোটি কোটি মেহনতি মানুষকে শোষণের এই ‘দমনমূলক’ ব্যবস্থা, তাকে হটিয়ে আনতে হবে এমন এক ‘বিশেষ দমনমূলক’ ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণি বুর্জোয়া শ্রেণিকে দমন করতে পারবে (সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব)। ‘রাষ্ট্র হিসেবে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি’র প্রকৃত অর্থ এই। সমাজের পক্ষ থেকে উৎপাদনের উপায়গুলির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা বলতে ঠিক এটাকেই বোঝায়। এবং এটা স্বতঃসিদ্ধ যে একটি ‘বিশেষ শক্তি’কে (বুর্জোয়া) এভাবে হঠিয়ে আরেকটি ‘বিশেষ শক্তি’-কে (সর্বহারা) ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা করতে গেলে তা নিছক ‘ক্রমবিলোপে’র পথে সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের ‘ক্রমবিলুপ্তি’ বা আরও সাজিয়ে গুছিয়ে রঙ চড়িয়ে বললে রাষ্ট্রের ‘নিজেকে নিজে বিলুপ্ত করা’ বলতে এঙ্গেলস অত্যন্ত স্পষ্ট করে সেই সময়কার কথাই বলেছেন, যখন রাষ্ট্র সমগ্র সমাজের হয়ে উৎপাদনের উপায়গুলির দখল নেবে, তার মানে তা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরের সময়ের কথা। আমরা সবাই জানি, সে সময় ‘রাষ্ট্রের’ রাজনৈতিক রূপটা হল পূর্ণতম গণতন্ত্র। কিন্তু যাঁরা নির্লজ্জভাবে মার্ক্সবাদের বিকৃতি ঘটিয়ে চলেছেন, সেইসব সুবিধাবাদীদের মাথায় এটা ঢোকেনি যে এঙ্গেলস এখানে একই সাথে বলেছেন এর মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের ‘বিলুপ্তি’র কথাও। প্রথম শুনলে আশ্চর্য হওয়ারই কথা। কিন্তু যাঁরা ভেবে দেখেন না যে, গণতন্ত্রও আসলে রাষ্ট্রেরই একটি রূপ, যে কারণে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটলে গণতন্ত্রেরও বিলুপ্তি ঘটাই স্বাভাবিক, এই কথাটা একমাত্র তাঁদের কাছেই অবোধ্য ঠেকবে। একমাত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়েই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের উচ্ছেদ সম্ভব। কিন্তু রাষ্ট্র একটি ব্যবস্থা হিসেবে, একমাত্র পরিপূর্ণ বিকশিত অবস্থাতেই ‘ক্রমবিলুপ্তি’র পথে যেতে পারে।

চতুর্থত, ‘রাষ্ট্রের বিলুপ্তি’ সংক্রান্ত এই চমৎকার প্রতিপাদ্যটি রচনার সময়ই এঙ্গেলস পরিষ্কার করে দেন এর মূল লক্ষ্য সুবিধাবাদী ও নৈরাজ্যবাদীরা উভয়েই। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এঙ্গেলস দেখান— প্রতিপাদ্যটি থেকে উপনীত রাষ্ট্র বিলুপ্তির সিদ্ধান্তটি সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

কিন্তু বাজি রেখে বলা যায়, যদি ১০ হাজার জন ‘রাষ্ট্রের বিলুপ্তি’ সংক্রান্ত এই তত্ত্বটি পড়ে থাকেন বা শুনে থাকেন, দেখা যাবে তাঁদের মধ্যে ন’হাজার নশো নব্বই জনই হয় বোঝেনইনি অথবা মনে করতে পারছেন না যে, প্রতিপাদ্যটি থেকে টানা এঙ্গেলসের সিদ্ধান্তটি শুধুমাত্র নৈরাজ্যবাদীদেরই বিরুদ্ধে প্রযোজ্য নয়। আর যে ১০ জন বাকি রইলেন, দেখা যাবে তাঁদের মধ্যেও ৯ জনই হয়তো জানেন না ‘মুক্ত গণরাষ্ট্র’ কথাটির মানে কী এবং কেন এই শব্দবন্ধটিকে আক্রমণ করলে তার মাধ্যমে সুবিধাবাদীদের আক্রমণ করা হয়। এইভাবেই ইতিহাস লেখা হয়! এইভাবেই মহান বিপ্লবী শিক্ষাকেও অজান্তেই মিথ্যা ও কায়েমি স্বার্থের অনুকূলে গতানুগতিকতার মধ্যে টেনে নামানো হয়। প্রতিপাদ্যটি থেকে নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যাওয়া সিদ্ধান্তটি হাজারবার আওড়ানো হয়ে থাকে, এভাবে বারবার পুনরুক্তির মাধ্যমে সেটাকে প্রায় ছেঁদো কথায় পর্যবসিত করা হয়, কথাটির অতি সরলীকরণ ঘটানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাকে একধরনের পক্ষপাতদুষ্ট কুসংস্কারের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়, অন্যদিকে সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে যাওয়া সিদ্ধান্তটিকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়, তাকে নিক্ষেপ করা হয় এক অন্ধকার কোণে!

‘মুক্ত গণরাষ্ট্র’ ছিল ’৭০-এর দশকের (১৮৭০-এর দশক) জার্মান সোসাল ডেমোক্র্যাটদের একটি কর্মসূচিগত দাবি ও চলতি স্লোগান। কিন্তু এই স্লোগানের মধ্যে রাজনৈতিক সারবত্তা কিছু ছিল না, যা ছিল তাকে বলা যেতে পারে গণতন্ত্রের নামে একধরনের বাগাড়ম্বর। যতদূর পর্যন্ত তা একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কথা তুলে ধরত, এঙ্গেলস প্রতিবাদী আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাময়িকভাবে এতদূর পর্যন্ত স্লোগানটি মেনে নিতে রাজি ছিলেন। কিন্তু বস্তুত স্লোগানটি ছিল সুবিধাবাদীসুলভ, কারণ তার মাধ্যমে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উপর রঙের প্রলেপই শুধু দেওয়া হচ্ছিল, কিন্তু সাধারণভাবে রাষ্ট্র সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক সমালোচনার অভাব তার মধ্যে বড়ই প্রকট। আমরা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পক্ষে, কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে রাষ্ট্র হিসাবে এটাই শোষিত শ্রেণির পক্ষে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু আমাদের ভুলে যাওয়ার কোনও অধিকার নেই যে, সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রেও শেষ পর্যন্ত সেই মজুরি-দাসত্বই সাধারণ মানুষের ভবিতব্য। তাছাড়া রাষ্ট্র মাত্রেই হল নিপীড়িত শ্রেণিকে দমন করে রাখার একটি

ছয়ের পাতায় দেখুন

পাঠকের মতামত

আমার জীবনে গণদাবী

লেনিন বলেছিলেন, "অ্যান অর্গান ইজ অ্যান অর্গানাইজার ইটসেলফ।" কথাটি যে কতখানি বাস্তব তা আমার নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছি। সেই উপলব্ধিই আজ গণদাবী পত্রিকার 'পাঠকের মতামত' বিভাগে রাখলাম।

সাল ২০১৩, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সূত্রে কলকাতায় প্রথম আসা। সদ্য কেনা ফ্ল্যাটে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু। বাবা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের সমর্থক এবং সেই সময় থেকেই টালিগঞ্জে পার্টি সংগঠনের কাজ শুরু করেন। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের মুখপত্র গণদাবী প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত ফ্ল্যাটে আসত। রাজনীতিতে তখন আমার কোনও আগ্রহই ছিল না, বরং অতি সন্তর্পণে গা এড়িয়ে চলতাম। নতুন শহরে না ছিল সে রকম কোনও বন্ধু, না ছিল সে রকম কোনও প্রতিবেশী। ফ্ল্যাট কালচারের বদ্ধ ঘরের মতো আমার জীবনও হয়ে পড়ে একপ্রকার বদ্ধই। পড়াশোনায় সে রকম আগ্রহ ছিল না। কিন্তু একাকিত্ব থেকে মুক্তি পেতে সময় কাটানোর জন্য দৈনিক খবরের কাগজ ও বাবার গণদাবীতে মাঝে-মধ্যে চোখ বোলাতাম। প্রথম প্রথম গণদাবীর শুধু হেডলাইনগুলোই পড়তাম আর ছবিগুলো দেখতাম। একটু একটু করে গণদাবীর তৃতীয় পাতায় ছাপা বিভিন্ন তাত্ত্বিক লেখাগুলোতে আকৃষ্ট হতে লাগলাম। সবটা বুঝতাম না, আবার কিছু কিছু বুঝতাম। মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও, শিবদাস ঘোষের লেখাগুলো পড়েই মার্ক্সবাদ, কমিউনিজম নিয়ে একটা আগ্রহ গড়ে ওঠে।

লেখাগুলো পড়ে আজকের সমাজের সমস্যাগুলোকে যখন রিলেট করতাম, লেখাগুলো তখন বাস্তব হয়ে ফুটে উঠত আমার কাছে। তারপর থেকেই গণদাবীতে ছাপা বিভিন্ন আন্দোলনের খবর, সাংগঠনিক খবর, সাম্প্রতিক ঘটনার তথ্যসমৃদ্ধ যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণগুলো খুব আগ্রহ নিয়ে পড়তাম। আর এ ভাবেই দলের নেতাকর্মীদের সংস্পর্শে আসার আগেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রতি একটা মন গড়ে ওঠে স্রেফ গণদাবী পড়েই।

গণদাবীর মতো এত বড় মাপের সংগঠকের সংস্পর্শে এসেই জীবনের শূন্যতা ভরে ওঠে রাজনীতির মননে, স্বপ্ন দেখা শুরু করি এক নতুন সমাজ গড়ে তোলার।

মহম্মদ মহিউদ্দিন রেজা
কলকাতা ৭০০০৭০

স্বাস্থ্যকর্মীর মর্যাদার দাবিতে আন্দোলন সিএইচজি ও টিডি কর্মীদের

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরে বহু বছর সিএইচজি ও টিডি কর্মীরা মাত্র ৫০ টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিযুক্ত হয়ে ছিল। সুদীর্ঘ প্রায় ৩০-৩২ বছর ধরে সিএইচজি কর্মীরা ব্যাগের মধ্যে ওআরএস, প্যারাসিটামল, অ্যান্টাসিড, মেট্রোনিডাজোল, নরফ্লক্স সহ আরও বহু রকমের ওষুধ নিয়ে দ্রুত পরিষেবা দেওয়ার জন্য গ্রামের অসুস্থ ও দরিদ্রতম মানুষের কাছে পৌঁছে যেত। প্রয়োজনে অসুস্থ ব্যক্তিকে হাসপাতালে পৌঁছে দিত। টিডি কর্মীরা প্রসূতি মায়েদের হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া সহ শিশু ও মায়েদের পরিষেবা দিত। ২০১৩ সালের পর থেকে কোনও এক অজানা কারণে তাঁদের কাজের গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে পারিশ্রমিক সামান্যতম বৃদ্ধি হয়ে দাঁড়ায় সিএইচজি কর্মীদের মাসিক ৪০০ টাকা ও টিডি কর্মীদের ৫৫০ টাকা। এই সামান্য পারিশ্রমিকে এই কর্মীরা স্বাস্থ্যকর্মীর মর্যাদা ছাড়াই স্বাস্থ্যদপ্তরে আজও কাজ করে চলেছে।

এই পরিস্থিতিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিউনিটি হেলথ গাইড ইউনিয়নের (এআইইউটিইউসি অনুমোদিত) পক্ষ থেকে ন্যূনতম মজুরি ২১ হাজার টাকা, অবসরকালীন পেনশন ভাতা, গ্র্যাচুইটি প্রদানের ব্যবস্থা, মৃত ও অক্ষম পোষ্যের চাকরির ব্যবস্থা ইত্যাদি দাবিতে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১২ অক্টোবর হাওড়া গ্রামীণ জেলার বাগনানে টিডি ও সিএইচজি কর্মীদের নিয়ে একটি সভা হয়। আগামী দিনে আন্দোলন সংগঠিত করার লক্ষ্যে শান্তা বোসকে সভানেত্রী, অসীমা গুছাইতকে সম্পাদিকা ও শাহানারা বেগমকে কোষাধ্যক্ষ করে একটি কমিটি গঠিত হয়।

আন্দোলনের জোরে প্রাপ্য মজুরি আদায় করলেন পরিযায়ী শ্রমিকরা

কেরালার কোল্লামে জাতীয় সড়ক তৈরিতে দু'মাসেরও বেশি সময় কাজ করেছেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার রাঙ্গাবেলিয়া অঞ্চলের বাগবাগান গ্রামের ৮ জন পরিযায়ী শ্রমিক। কিন্তু চেন্নাই-এর ঠিকাদার তাঁদের প্রাপ্য মজুরির টাকা আটকে রেখেছিল। ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা এআইইউটিইউসি অনুমোদিত অল ইন্ডিয়া মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নেতৃত্বের কাছে বিষয়টি জানান। তাঁরা এআইইউটিইউসি অনুমোদিত কেরালা রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করেন। কেরালায় সংগঠনের পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধ করা হলেও ঠিকাদার নানা অজুহাতে শ্রমিকদের টাকা দেয়নি। কেরালা রাজ্য শ্রম দপ্তরের কাছে অভিযোগ জানানো হলে বেশ কয়েকবার দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। অবশেষে কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিক সংগঠনের লাগাতার প্রচেষ্টায় ঠিকাদার ৩১ অক্টোবর শ্রমিকদের প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দিতে বাধ্য হয়। ফলে শ্রমিক পরিবারগুলির মুখে হাসি ফুটেছে এবং আন্দোলনের এই জয়ে উৎসাহিত হয়ে বঞ্চিত পরিযায়ী শ্রমিকরা নিজেদের সংগঠিত করতে শুরু করে দিয়েছেন।

'সশস্ত্র বিপ্লব' ও রাষ্ট্রের 'বিলুপ্তি'

পাঁচের পাতার পর

'বিশেষ' যন্ত্র। ফলে রাষ্ট্র কখনও স্বাধীন বা 'মুক্ত' হতে পারে না, 'জনরাষ্ট্রও' হতে পারে না। মার্ক্স এবং এঙ্গেলস এ কথা '৭০-এর দশকে তাঁদের পার্টি কমরেডদের কাছে বারেবারে ব্যাখ্যা করে বলেছেন।

পঞ্চমত, এঙ্গেলসের যে রচনাটিতে সকলের মনে রাখার মতো এই 'রাষ্ট্রের বিলুপ্তি'র কথাটি আছে, সেই একই রচনায় সশস্ত্র বিপ্লবের তাৎপর্যের কথাও আছে। এখানে এঙ্গেলস সশস্ত্র বিপ্লবের ঐতিহাসিক ভূমিকা বিশ্লেষণ তুলে ধরতে গিয়ে যা বলেছেন, তা আসলে তার প্রশংসাই। কিন্তু এই অংশটি কেউ মনে রাখে না। আধুনিক সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলোতে এর তাৎপর্য নিয়ে কথা বলা বা এমনকি ভাবারও খুব একটা চল নেই, জনগণের মধ্যে তাদের দৈনন্দিন প্রচার ও আন্দোলনে এই ভাবনাটির কোনও ভূমিকাই দেখা যায় না। অথচ 'রাষ্ট্রের বিলুপ্তি' সাথে এই ধারণাটিও অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত এবং দুয়ে মিলেই একটি সমগ্র ধারণায় পৌঁছানো সম্ভব।

এঙ্গেলস বলেছেন ঃ "... ইতিহাসে বলপ্রয়োগের (ধ্বংসাত্মক ভূমিকা ছাড়াও) অন্য আরও একটি ভূমিকা রয়েছে, বিপ্লবী ভূমিকা। মার্ক্সের ভাষায়, প্রতিটি পুরাতন সমাজের গর্ভে নতুন সমাজ জন্ম নেওয়ার সময় বলপ্রয়োগ ধাত্রীর ভূমিকা পালন করে। এই হল সেই শক্তি, যার বলে সামাজিক আন্দোলন ফসিলে পরিণত হওয়া মৃত রাজনৈতিক আধারটিকে চূর্ণ করে নিজের পথ করে নেয়— কিন্তু এ সম্পর্কে হের ড্যুরিং একটি কথাও বলেননি। অনেক দীর্ঘশ্বাস ও কাতরোক্তির সাথে ড্যুরিং শুধু এই সম্ভাবনাটির কথা মেনেছেন যে, শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্য হয়তো বা বলপ্রয়োগের দরকার হবে, কিন্তু সেটা তাঁর খেদের কথা। কেন না বলপ্রয়োগ মাত্রেই, তাঁর মতে, বলপ্রয়োগকারীর নীতিবোধকে কলুষিত করে। এই কথা তিনি বলেছেন জার্মানি সম্পর্কেও, যেখানে গত ত্রিশ বছরের যুদ্ধের হীন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জাতীয় চেতনায় গড়ে ওঠা দাসত্বের মনোবৃত্তি দূর হতে পারে একমাত্র কোনও সশস্ত্র সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই, এমনকি তা যদি মানুষের উপর চাপিয়েও দেওয়া হয় তা হলেও এটা সম্ভব। অথচ ড্যুরিংয়ের এমন একটা স্থবির, নিষ্প্রভ ও অক্ষম ধারণা কিনা চেপে বসার কথা বলছে এমন একটি দলের চিন্তার উপর, যারা কিনা ইতিহাসে সর্বাধিক বিপ্লবী দল হিসেবে পরিচিত! (পৃঃ- ১৯৩, ৩য় জার্মান সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ৮র্থ পরিচ্ছেদের শেষ)

১৮৭৮ থেকে ১৮৯৪ সাল, অর্থাৎ আমৃত্যু এঙ্গেলস যে জার্মান সোসাল ডেমোক্র্যাটদের উদ্দেশ্যে একরোখার মতো সশস্ত্র বিপ্লবের তাৎপর্য তুলে ধরে তার প্রশস্তি গেয়ে চলেন, তার সাথে এখন 'রাষ্ট্রের বিলুপ্তির' তত্ত্বকে মেলানো যায় কী করে?

সাধারণত এ দু'টি তত্ত্বকে মেলানো হয় পল্লবগ্রাহিতায়, নিজের খুশিমতো (অথবা ক্ষমতাসীনদের তোষণার্থে) নীতিহীন বা কূটতার্কিকের মতো কখনও এ যুক্তিকে, কখনও-বা ও যুক্তিকে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে তারা শেষ পর্যন্ত যেখানে উপনীত হয়, দেখা যায় সামনে তুলে ধরা হয় ওই 'রাষ্ট্রের বিলুপ্তি'র কথাটুকুকেই। দ্বান্দ্বিকতার স্থান নেয় পল্লবগ্রাহিতা— এই হল আজকের সোসাল ডেমোক্র্যাট সাহিত্যে মার্ক্সবাদ সম্পর্কে চলতি ও বহুল ব্যবহৃত আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত মত। এইরকমের বদল অবশ্য নতুন কিছু নয়, চিরায়ত গ্রিক দর্শনের ক্ষেত্রেও এরকম পরিলক্ষিত হয়। মার্ক্সবাদের নামে সুবিধাবাদী কারচুপি চালাতে গিয়ে দ্বান্দ্বিকতার বদলে পল্লবগ্রাহিতা চালালে মানুষকে ঠকানো সহজ হয়, এতে আপাতদৃশ্য একটা তৃপ্তি মেলে— যেন প্রক্রিয়াটির সব দিক, বিকাশের সব প্রবণতা, সমস্ত বিরোধাত্মক প্রভাব প্রভৃতির হিসেব নেওয়া হয়েছে, অথচ সমাজ বিকাশ প্রক্রিয়ার কোনও সামগ্রিক বা বৈপ্লবিক উপলব্ধি তা থেকেই মেলে না।

আমরা আগেই বলেছি এবং পরে আরও বিশদে দেখাব, সশস্ত্র বিপ্লবের অনিবার্যতা সম্পর্কে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের মতবাদ বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বুর্জোয়া রাষ্ট্র কখনও রাষ্ট্রের বিলুপ্তির প্রক্রিয়ায় সর্বহারা রাষ্ট্রে (সর্বহারার একনায়কত্ব) পরিণত হতে পারে না, তার জন্য দরকার 'সশস্ত্র বিপ্লব'। এঙ্গেলস সশস্ত্র বিপ্লব সম্পর্কে যা বলেছেন এবং মার্ক্সের একাধিক জায়গায় বলা উক্তির সাথেও যা মেলে (স্মরণ করা যাক 'দর্শনের দারিদ্র' ও 'কমিউনিস্ট ইশতেহার-এর শেষাংশের কথা, যেখানে সশস্ত্র বিপ্লবের অনিবার্যতা নিয়ে প্রকাশ্য বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, বা তার প্রায় তিরিশ বছর পরে ১৮৭৫ সালে রচিত গোথা কর্মসূচির সমালোচনা, যেখানে মার্ক্স এ কর্মসূচির সুবিধাবাদকে নির্মমভাবে কষাঘাত করেছেন) —এই প্রশস্তি কোনও আবেগের প্রকাশ নয়, কোনও বাগাড়ম্বরও নয়, কোনও কথার চাল ভাবারও কোনও কারণ নেই একে।

মার্ক্স ও এঙ্গেলসের সমগ্র মতবাদের শিকড়ই হল সশস্ত্র বিপ্লবের এই রূপ এবং ঠিক সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই মানুষকে নিয়মিত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা আবশ্যক। অথচ বর্তমানে বহুল প্রচলিত ও ক্ষমতাশালী সোসাল শভিনিস্ট ও কাউটস্কিপন্থী ধারাগুলির তাঁদের এই মতবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা প্রকট হয়ে ওঠে যখন আমরা দেখি, সেরকম কোনও প্রচার বা আন্দোলনের কথাই এই ধারাগুলি ভেবেও দেখে না।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বদলে সর্বহারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া সম্ভবই নয়। আবার সর্বহারা রাষ্ট্রের বিলোপ অর্থাৎ রাষ্ট্রব্যবস্থার অবলুপ্তি ক্রমবিলোপের পথেই একমাত্র ঘটতে পারে। এই বিষয়টির উপর মার্ক্স ও এঙ্গেলস আলাদা আলাদা করে প্রতিটি বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বিচার করে, পৃথক পৃথক প্রতিটি বিপ্লবের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে বিশদ আলোচনা ও বাস্তব বিশ্লেষণ রেখে গেছেন। তাঁদের মতবাদের এই অংশ নিঃসন্দেহেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এরপর সেই আলোচনায় ঢুকব। (চলবে)

নির্বাচনী বন্ড

একের পাতার পর

করা হয়েছে এমনভাবে যাতে ভারতে রেজিস্ট্রিকৃত বিদেশি কোম্পানিগুলি রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে যত খুশি টাকা দিতে পারে।

২০১৪ সাল থেকেই বিজেপি নির্বাচনে যে বিপুল পরিমাণে টাকা উড়িয়ে চলেছে, তার উৎস যে দেশীয় ধনকুবেরদের সঙ্গে তাদের গোপন বোঝাপড়া, সেটিকে দেশের জনসাধারণের চোখ থেকে আড়াল করতেই বন্ডের এই সুচতুর ধাপ্পাটি তারা আমদানি করেছে। পুঁজিপতিরা এই বন্ডের মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ টাকা রাজনৈতিক দলগুলিকে দিয়েছে তার বেশির ভাগটাই ঢুকেছে শাসক বিজেপির ভাঁড়ারে। ২০১৭-১৮ থেকে ২০২১-২২ অর্থবর্ষ পর্যন্ত বন্ডে বিজেপি পেয়েছে ৫,২৭১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা।

কারা দিল বিজেপিকে এই বিপুল পরিমাণ টাকা? কেন দিল? কীসের বিনিময়ে দিল? এই সব প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে স্বভাবতই বিজেপি নেতাদের মহা আপত্তি। উল্লেখ করা দরকার, কংগ্রেস সহ অন্য সব শাসক দলই পরিমাণে বিজেপির থেকে কম হলেও এই চাঁদা পেয়ে থাকে।

সুপ্রিম কোর্টে এই সংক্রান্ত একটি মামলা শুরু হয়েছে। শুরুর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল আর ভেঙ্কটরামানি শীর্ষ আদালতে হলফনামা দিয়ে দাবি করেছেন, নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের আর্থিক অনুদানের উৎস জানার অধিকার নাগরিকদের নেই, থাকতে পারে না। বলেছেন, কোন রাজনৈতিক দলের ভাঁড়ারে কোন পুঁজিপতির থেকে কত টাকা এসেছে, এই তথ্য না জানানোটা কোনও বিদ্যমান অধিকার লঙ্ঘনের মধ্যে পড়ে না এবং সংবিধানের দেওয়া মৌলিক অধিকারের পরিপন্থীও নয়। বলেছেন, সাংবিধানিক আদালত সরকারের কোনও পদক্ষেপের পুনর্মূল্যায়ন তখনই করতে পারে, যখন তা কোনও বিদ্যমান অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। বলেছেন, যদি কোনও বিষয়কে প্রথম বার অধিকারের আওতায় আনার প্রশ্ন ওঠে, সে ক্ষেত্রে বিষয়টি সাধারণ্যে এবং সংসদীয় বিতর্কেই নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন।

দেখা যাক, বিজেপির দেওয়া যুক্তির আদৌ কোনও সারবত্তা আছে কি না। প্রথম কথা, একটি 'গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রে 'গণ' মানে তো দেশের জনগণ। অন্য যে কোনও রাজনৈতিক দলের মতো বিজেপি নেতারাও তো দাবি করেন যে, তাঁরা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন। তা হলে, দল পরিচালনার জন্য, নির্বাচনে খরচের জন্য টাকাও জনগণেরই দেওয়ার কথা এবং দলেরও জনগণের সামনে তাদের দল পরিচালনা ও নির্বাচনী ব্যয়ের জন্য টাকা কোথা থেকে আসছে তা খোলামেলা ভাবেই রাখার কথা। বিজেপি নেতাদের সেই সত্য জনগণকে জানাতে ঘোরতর আপত্তি। কেন? তবে কি তাঁদের দলের টাকার উৎসটি এমন, যে তা প্রকাশ্যে আনা যায় না? না হলে যে জনগণের ভোটে তাঁরা নির্বাচিত হচ্ছেন, বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রী হচ্ছেন, সরকার চালাচ্ছেন, সেই জনগণকে এ ব্যাপারে অন্ধকারে রাখতে চাইছেন কেন? এমনকি সংবিধান অনুযায়ীও একজন নাগরিকের রাজনৈতিক দলগুলির আয় সম্পর্কে জানার অধিকার রয়েছে। এই যে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে ধনকুবেরদের দেওয়া টাকা বিজেপির ভাঁড়ারেই সবচেয়ে বেশি ঢুকছে, তা তো এমনি এমনি নয়। যে পুঁজিপতিরা শ্রমিক-কৃষক-জনগণের ঘাম-রক্ত-জীবন লুট করে মুনাফা কামায়, তারা এমনি এমনি কোনও রাজনৈতিক দলকে 'চাঁদা' দিচ্ছে, এটা নিশ্চয় কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন কোনও মানুষ বিশ্বাস করবে না। তা হলে তারা বিজেপিকে এই বিপুল পরিমাণ টাকা কীসের বিনিময়ে দিচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর জানাটা দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, তা বিজেপি নেতারা যতই সেই অধিকারকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করুন।

এ কথা আজ আর কারও অজানা নয় যে, বিজেপি সরকার ক্ষমতার বসার সময় থেকেই অতি নগ্ন ভাবে দেশের একচেটিয়া পুঁজির সেবা করে চলেছে। ধনকুবেরদের স্বার্থেই একের পর এক যেমন আইন নিয়ে এসেছে, তেমনই নিয়ে চলেছে প্রশাসনিক পদক্ষেপ। একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে আনা কৃষি আইনের কথা আজ আর কারও অজানা নয়। গত প্রায় আট দশক ধরে দেশের জনগণের অর্থে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে পাইকারি হারে তারা এই পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে। ফলে তেল, রেল, ব্যাঙ্ক, বিমা, বন্দর, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সব কিছু, যা কিছুই জনগণের সম্পত্তি, তা আজ একচেটিয়া পুঁজির দখলে। তাদের সেবায় এ ভাবে জনস্বার্থকে বলি দেওয়ার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই বিজেপি ধনকুবেরদের সবচেয়ে আস্থাভাজন দলে পরিণত হয়েছে।

জনগণের স্বার্থে কাজের সাফল্যের নিরিখে সমর্থন চাওয়া নয়, টাকা ছড়িয়ে প্রচারের জৌলুসে মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া, ভোট কিনে ক্ষমতার গদি দখল করা এবং তাতে টিকে থাকা। অর্থাৎ জনস্বার্থকে পদদলিত করেও টাকা ছড়িয়ে এবং প্রচারের জোরে ক্ষমতা দখল করে আবার আরও বেপরোয়া ভাবে জনস্বার্থকে পদদলিত করা এবং পুঁজিপতি শ্রেণির সেবা করা। ফলে বুঝতে অসুবিধা হয় না, বিজেপি নেতারা স্বীকার না করলেও, নির্বাচনী বন্ডের দ্বারা অবৈধ ভাবে পাওয়া টাকার জোরে বাস্তবে তারা স্বচ্ছ এবং মুক্ত ভোটের যে গণতান্ত্রিক অধিকার তাকেই হরণ করছেন। আর প্রিয় দলকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে তারা এ ভাবে তাদের পিছনে টাকা ঢেলে যাবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বিজেপি নেতারা এই টাকার 'সদ্ব্যবহার'ও সেভাবেই করছেন।

শাসক দলগুলির নেতারা যেমন পুঁজিপতিদের নানা নামে দেওয়া এই টাকায় হেলিকপ্টার চড়ে, দামি গাড়ি চড়ে, বিপুল বৈভবে জীবন কাটায়, টাকা ছড়িয়ে অনুগত বাহিনী তৈরি করে, নির্বাচনে যথেচ্ছ খরচ করে, উল্টোদিকে পুঁজিপতিরা তাদের পছন্দমতো রাজনৈতিক দলকে 'পলিটিকাল ম্যানেজার' হিসাবে সরকারি গদিতে বসায়। ঠিক করে দেয় ভোটে কে প্রার্থী হবে, জিতে কে মন্ত্রী হবে, কোন বিষয়ে আইন তৈরি করতে হবে, কোন আইনকে বদলাতে হবে। অনেকেরই মনে আছে, টু-জি কেলেঙ্কারির তদন্তের সময়ে বেরিয়ে এসেছিল যে, ডি রাজাকে টেলিকম মন্ত্রী করার পিছনে টাটার সুপারিশ ছিল। পরবর্তী কালে গোপনীয়তার ফাঁক গলে বারে বারে বেরিয়ে এসেছে যে, তেলমন্ত্রী ঠিক করার পিছনে আম্বানি সহ তেল লবির হাত কী ভাবে কাজ করে। জনবিরোধী কৃষি আইন তৈরির পিছনে যে আদানিদের হাত ছিল তা প্রকাশ্যে এসে গেছে।

কাজেই নির্বাচনী বন্ডের আড়ালে যতই বিজেপি নেতারা পুঁজিপতিদের সাথে তাদের আঁতাত আড়াল করার চেষ্টা করুক, এই বন্ডের দুর্নীতি আজ দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। দেশের জনসাধারণ দাবি করছে, সুপ্রিম কোর্ট এই বন্ড ব্যবস্থাকে বাতিল করুক।

ইজরায়েলের ফ্যাসিস্ট চরিত্র সম্পর্কে ১৯৪৮ সালেই সতর্ক করেছিলেন

মহান মানবতাবাদী বিজ্ঞানী আইনস্টাইন

সম্পাদকের প্রতি চিঠি

নিউ ইয়র্ক টাইমস। ৪ ডিসেম্বর, ১৯৪৮

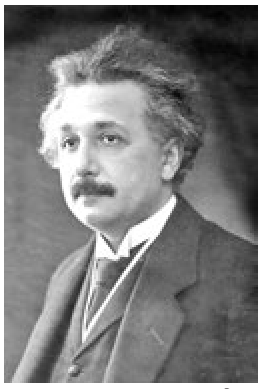

আমাদের বর্তমান সময়ে একটি উদ্বেগজনক রাজনৈতিক ঘটনা হল, নতুন তৈরি ইজরায়েল রাষ্ট্রে 'ফ্রিডম পার্টি'-র আবির্ভাব। এই রাজনৈতিক দলটির সংগঠন পরিচালন পদ্ধতি, রাজনৈতিক দর্শন এবং সামাজিক আবেদন— সর্বদিক দিয়েই নাৎসী এবং ফ্যাসিবাদী দলগুলির সমতুল্য। এই দলটির সদস্যরা এসেছেন প্যালেস্টাইনের পূর্বতন 'ইরগুন জাভাই লেউমি' নামের একটি সন্ত্রাসবাদী দক্ষিণপন্থী জাতিদম্ভী সংগঠন থেকে।

এই পার্টির নেতা মেনাচেম বেগিনের বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফর অবশ্যই উদ্দেশ্যমূলক এবং সেটি হল ইজরায়েলের আসন্ন নির্বাচনে আমেরিকার সমর্থন আছে এই ভাবমূর্তি তৈরি করা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত রক্ষণশীল জায়নবাদী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা। বহু স্বনামধন্য মার্কিন নাগরিক বেগিনের মার্কিন সফরকে স্বাগত জানিয়েছেন। যাঁরা বিশ্ব জুড়ে ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করছেন, তাঁরা যদি বেগিনের রাজনৈতিক রেকর্ড এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে যথাযথ অবহিত হতেন, তা হলে বেগিন যে আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করেন, তার প্রতি তারা আর সমর্থন জানাতে পারতেন না। বিপুল পরিমাণ আর্থিক সাহায্য দানের দ্বারা বেগিনের তরফে জনগণের সামনে একটা ভালো ভাবমূর্তি গড়ে তোলার আগেই এবং ইজরায়েলের ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলিকে আমেরিকা সমর্থন করে এই ধারণা গড়ে ওঠবার আগেই মার্কিন জনগণকে বেগিন এবং তার আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা দরকার। বেগিনের দল সম্পর্কে প্রকাশ্য স্তুতি থেকে সে দলের প্রকৃত চরিত্র ধরা যাবে না। এখন তারা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার কথা বলছে, অথচ কিছু দিন আগে পর্যন্ত তারা প্রকাশ্যে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের তত্ত্ব প্রচার করেছে। এই সন্ত্রাসবাদী দলটি তাদের কাজকর্মের দ্বারাই তাদের আসল চরিত্র তুলে ধরেছে। তাদের অতীতের কার্যকলাপ থেকেই বিচার করা যায়, ভবিষ্যতে তাদের থেকে কী আশা করা যেতে পারে।

আরব গ্রামের উপর আক্রমণ

'দের ইয়াসিন' নামে আরব দেশের একটি গ্রামে এদের আচরণ একটি ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মূল রাস্তার পাশে এবং ইহুদিদের অধিকৃত জমির দ্বারা পরিবেষ্টিত এই গ্রামটি যুদ্ধে কোনও অংশই নেয়নি, এমনকি আরব বাহিনী, যারা এই গ্রামটিকে তাদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল, এরা সেই আরব বাহিনীর বিরুদ্ধে পর্যন্ত লড়েছিল। ৯ এপ্রিল সন্ত্রাসবাদী দল এই শান্তিপূর্ণ গ্রামটিকে আক্রমণ করে, যা কোনও ভাবেই যুদ্ধের অংশ ছিল না। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীকে তারা হত্যা করে, নারী-পুরুষ-শিশু মিলিয়ে যার সংখ্যা ২৪০ জন এবং জীবন্ত কয়েক জনকে বন্দি করে জেরুজালেমের রাস্তায় প্যারেড করায়। ইহুদি সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষই এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয় এবং ইহুদিদের পক্ষ থেকে ট্রান্স জর্ডানের রাজা আবদুল্লার কাছে ক্ষমা চেয়ে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়।

কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা এতে লজ্জা পাওয়ার পরিবর্তে এই হত্যাকাণ্ডে গৌরব বোধ করে ও এর পক্ষে প্রচার চালায় এবং দেশে উপস্থিত সকল বিদেশি সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে স্তূপীকৃত মৃতদেহ এবং ভয়াবহ ধ্বংসলীলা দেখায়। দের ইয়াসিনের ঘটনা ফ্রিডম পার্টির কাজ ও চরিত্রের একটা ন্যক্কারজনক দৃষ্টান্ত হিসেবে হয়ে আছে।

তারা উগ্র জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় রহস্যবাদ এবং জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার একটা মিশ্রণ ঘটিয়ে ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার চালিয়েছে। অন্যান্য ফ্যাসিস্ট পার্টির মতো এদেরকেও ধর্মঘট ভাঙতে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এরা নিজেরাও স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন ধ্বংস করার দাবি তুলেছে। পরিবর্তে ইটালীয় ফ্যাসিস্ট মডেল অনুযায়ী কর্পোরেট ইউনিয়ন করার প্রস্তাব দিয়েছে। ব্রিটিশ বিরোধী বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভ ও হিংসার শেষ বছরগুলিতে এই সব গোষ্ঠীগুলি প্যালেস্টাইনের ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ত্রাসের ঝড় বইয়ে দেয়। তাদের বিরুদ্ধে বলার অপরাধে শিক্ষকদের মারধোর করা হয়, সন্তানদের তাদের দলে নাম না লেখানোর অপরাধে অভিভাবকদের গুলি করে মারা হয়। গুণ্ডামি মারধোর, ঘরের জানালা-দরজা ভেঙে দেওয়া, ব্যাপক চুরি, ডাকাতির মধ্য দিয়ে এই সন্ত্রাসবাদীরা জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তাদের প্রতি বিরুদ্ধতার মূল্য আদায় করে নেয়।

প্যালেস্টাইনের গঠনমূলক কার্যকলাপে এদের কণামাত্র অবদান নেই। এরা কোনও জমি নেয়নি, কোথাও কোনও বসতি স্থাপন করেনি, তাদের বহুপ্রচারিত অভিবাসন প্রচেষ্টা বাস্তবে ছিল নগণ্য এবং প্রধানত তা তাদের ফ্যাসিবাদী সহযোদ্ধাদের নিয়ে আসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ইতি

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

প্যালেস্টাইনে গণহত্যা বন্ধ করো

বিশ্বজুড়ে বিক্ষোভ শান্তিকামী মানুষের

সারা দুনিয়া জুড়ে শান্তিকামী মানুষ প্রতিদিন রাস্তায় নামছেন প্যালেস্টাইনের উপর ইজরায়েলের পৈশাচিক হানা বন্ধ করার দাবিতে। ব্রিটেন, আমেরিকা তো বটেই, ইউরোপের প্রায় সব দেশে, এশিয়া আফ্রিকায়, এমনকি যে দেশের সরকারগুলি মার্কিন তাঁবেদার বলে পরিচিত সেখানেও সাধারণ মানুষ অবিলম্বে এই গণহত্যা বন্ধের দাবিতে সোচ্চার।

মনে পড়ে যাচ্ছে দু'দশক আগের কথা। যখন, ইরাক এবং আফগানিস্তানে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী জোটের নিরন্তর ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন গোটা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ। পুঁজিবাদের তীব্র সংকট থেকে সাময়িক মুক্তির খোঁজেই ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সেই সামরিক অভিযান। 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে'র বকলমে বিশ্বের পয়লা নম্বর সন্ত্রাসবাদী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিজের অস্ত্র-ব্যবসার পালে কিঞ্চিৎ হাওয়ার জোগান পেতে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে খুন করেছিল। বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ সেদিন বুঝেছিলেন এই সত্য। তাই তাঁরা লাখে লাখে পথে নেমেছিলেন যুদ্ধের নামে চলমান গণহত্যার বিরুদ্ধে। খোদ আমেরিকা, ইংল্যান্ড সহ পুঁজিবাদী দুনিয়ার রাজপথ ভেসে গিয়েছিল প্রতিবাদী মানুষের জোয়ারে। দু'দশক পর আবারও সেই একই ছবি ফিরে এসেছে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে পথে নেমেছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ।

হামাস বিরোধিতার নামে আদতে প্যালেস্টাইনে নৃশংস গণহত্যা চালাচ্ছে ইজরায়েল। কার্যত নরককুণ্ডে পরিণত করা হয়েছে গাজাকে। প্রতিদিন শয়ে শয়ে শিশুকে হত্যা করা হচ্ছে। ঘুমোতে যাওয়ার আগে হাতে নিজেদের নাম লিখে রাখছে শিশুরা, যাতে বোমাবর্ষণে মারা গেলে বেওয়ারিশ লাশ হতে না হয়। এখনও পর্যন্ত প্রায় ১০ হাজার মানুষকে হত্যা করেছে ইজরায়েল। তার ৪০ শতাংশই শিশু। কারও বয়স ১ মাস, কারও ১ বছর বা ৩ বছর। গাজায় বিদ্যুৎ নেই, খাবার নেই, জল নেই। হাসপাতালে চিকিৎসার উপায় নেই। ন্যূনতম চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছে সদ্যোজাত শিশুরা। স্কুল, বসতি, উদ্বাস্তু শিবির এমনকি হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্সের উপর বৃষ্টির মতো বোমাবর্ষণ করছে ইজরায়েল। এই বীভৎস গণহত্যা দেখে স্বাভাবিক কারণেই চুপ করে থাকতে পারছেন না গোটা বিশ্বের হৃদয়বান মানুষ। তাঁরা দাবি তুলেছেন অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ হোক, অবিলম্বে বোমাবর্ষণ থামাক ইজরায়েল।

লন্ডনে প্রতি শনিবার যুদ্ধের বিরুদ্ধে মিছিল করছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। সংঘর্ষ শুরুর পর প্রথম মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন দেড় লক্ষ মানুষ। দ্বিতীয় মিছিলে সেই সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। তিন লক্ষ মানুষ পথে নামেন ইজরায়েলের গণহত্যার বিরুদ্ধে। তৃতীয় মিছিলে অংশ নেন আরও বেশি— ৫ লক্ষ মানুষ। কেবল লন্ডন নয়, গ্রেট ব্রিটেনের সর্বত্র ছোট বড় যুদ্ধবিরোধী সমাবেশ হচ্ছে। শ্রমিক সংগঠনগুলি সক্রিয় ভাবে এগিয়ে এসেছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার কাজে। প্রতিটি মিছিলেই সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে উপস্থিত থাকছেন ব্রিটেনের বামপন্থী এবং কমিউনিস্টরা। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আসছেন দল বেঁধে। বিরাট সংখ্যায় উপস্থিত হচ্ছেন জায়নবাদ বিরোধী ইহুদিরা। তাঁরা ব্যানার নিয়ে আসছেন প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে। বলছেন, 'নট ইন মাই নেম'— সাধারণ শান্তিকামী ইহুদিদের নামে এই গণহত্যা চালানো যাবে না।

ইংল্যান্ডের শাসকদল দক্ষিণপন্থী কনজারভেটিভ পার্টি সরাসরি ইজরায়েলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। বিরোধী লেবার পার্টির নেতা, যাঁকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী বলা হচ্ছে, সেই কের স্টামারও ইজরায়েলের পক্ষে।

সরকার যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনকারীদের উপর চাপ সৃষ্টির কৌশল নিয়েছে। বলা হয়েছে, প্যালেস্টাইনের পতাকা নিয়ে মিছিল করলে বা প্যালেস্টাইনের পক্ষে স্লোগান দিলে গ্রেফতার করা হবে। সেই হুমকি উড়িয়ে দিয়ে হাজার হাজার মানুষ প্যালেস্টাইনের পতাকা নিয়ে পথে নামছেন মানুষ। আন্দোলনের চাপ পড়ছে বুর্জোয়া দলগুলির ভিতরেও। ইতিমধ্যেই লেবার পার্টির প্রচুর কাউন্সিলর পদত্যাগ করেছেন। শতাধিক লেবার সাংসদ যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। খোদ স্টামারের শ্যাডো কাউন্সিলের একাধিক সদস্য লেবার পার্টির অবস্থানের বিরোধিতা করেছেন।

প্রতিবাদে উত্তাল ইউরোপের অন্যান্য দেশও। জার্মানি এবং ফ্রান্সে ইজরায়েলের গণহত্যার বিরুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ পথে নেমেছেন। বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে তাঁদের। প্যালেস্টাইনের পক্ষে জমায়েত নিষিদ্ধ করেছে প্রশাসন। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে পথে নামছেন মানুষ। একই ছবি নেদারল্যান্ডস, স্পেন, গ্রিস, বেলজিয়াম, ইটালি সহ সর্বত্র। প্রতিটি দেশেই গড়ে উঠছে প্যালেস্টাইন সলিডারিটি ক্যাম্পেন। বিক্ষোভে উত্তাল খোদ পুঁজিবাদের দুর্গ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও।

শিকাগো, ওয়াশিংটন ডিসি, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, বস্টন সহ সর্বত্র রাষ্ট্রীয় ভয়ভীতি উপেক্ষা করে পথে নেমেছেন যুদ্ধবিরোধী মানুষ। কিউবা, বলিভিয়া, ভেনেজুয়েলা, ব্রাজিল সহ লাতিন আমেরিকার একাধিক দেশ সংহতি জানিয়েছে প্যালেস্টাইনের সংগ্রামের প্রতি। আফ্রিকার দেশে দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ ইজরায়েলের গণহত্যার বিরুদ্ধে পথে নামছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা, সুদান, গ্যাবন, জিম্বাবোয়ে, মালি, তিউনিশিয়া, আইভরি কোস্ট, নাইজেরিয়া সহ সর্বত্র অবিলম্বে গাজায় বোমাবর্ষণ বন্ধের দাবিতে মিছিল হচ্ছে।

বিক্ষোভে প্রতিবাদে উত্তাল গোটা মধ্যপ্রাচ্য। তুরস্কে প্রতিদিন সাধারণ মানুষ পথে নামছেন প্যালেস্টাইনের সমর্থনে। তুরস্ক সরকারের প্রতি তাঁদের স্পষ্ট বার্তা, কেবল মৌখিক সমর্থন নয়, সরাসরি পাশে দাঁড়াতে হবে প্যালেস্টাইনের। একই ছবি মিশর এবং জর্ডনের। মিশরের বিক্ষোভকারীরা দাবি তুলেছেন, যুদ্ধে ঘরছাড়া, আহত প্যালেস্টিনীয়দের সব রকমের সাহায্য করুক মিশরের সরকার। জর্ডন পরিচিত মার্কিন-বন্ধু হিসাবে। সে-দেশের বিক্ষোভকারীরা দাবি তুলেছেন, অবিলম্বে গণহত্যাকারী ইজরায়েলের বিরোধিতা করুক জর্ডন সরকার। নয়তো আন্দোলন আরও তীব্র হবে। একই ছবি ইয়েমেন, লেবানন সহ সর্বত্র।

বিশ্ব জুড়ে গড়ে ওঠা এই প্রতিবাদের চরিত্র বহুমাত্রিক। কেবল রাজপথেই যে প্রতিবাদ হচ্ছে এমন নয়। প্রতিবাদ হচ্ছে খেলার মাঠেও। ইংল্যান্ডের দুই বিখ্যাত ফুটবল ক্লাব লিভারপুল এবং এভার্টনের সমর্থকরা গ্যালারিতে প্যালেস্টাইনের পতাকা উড়িয়েছেন। বিরাট ব্যানারে অবিলম্বে বোমাবর্ষণ বন্ধের দাবি তুলেছেন। স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত ক্লাব সেল্টিকের সমর্থকরা প্রতিটি ম্যাচেই গ্যালারি সাজিয়ে তুলছেন প্যালেস্টাইনের পতাকায়। আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের ফুটবল মাঠেও একই ছবি। তিউনিশিয়ার টেনিস তারকা ওনস জাবেউর টেনিস কোর্টেই সরব হয়েছেন হাজার হাজার শিশুহত্যার বিরুদ্ধে।

দু'দশক পর আবারও যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছেন গোটা পৃথিবীর শান্তিকামী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মানুষ। এই সংগ্রামের কেন্দ্রে পুঁজিবাদবিরোধী চেতনাকে নিয়ে আসার কাজ সংগ্রামী বামপন্থী শক্তির, বিপ্লবী কমিউনিস্টদের। কারণ যে সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ এবং গণহত্যার জনক, তার জন্ম পুঁজিবাদের গর্ভে। যুদ্ধ, অনাহার, গণহত্যার অবসান ঘটাতে পারে একমাত্র সমাজতন্ত্র। বিশ্বের দেশে দেশে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম যত তীব্রতর হবে, ততই বেগবান হবে শান্তির জন্য লড়াই।

দলের আহ্বানে ১ নভেম্বর ধিক্কার দিবসে দেশ জুড়ে বিক্ষোভ হয়। ছবি ঃ হরিয়ানার ভিওয়ানি ও ত্রিপুরার আগরতলা

ইজরায়েলি হানাদারি

প্রতিবাদে সরব বিশ্বের বিজ্ঞানীরাও

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায়, সভ্যতার সংকটময় সন্ধিক্ষণে যখন ক্ষমতার স্বার্থে বিজ্ঞানের অপব্যবহার ঘটেছে অবমাননা ঘটেছে, বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়ে বিজ্ঞানীরা এগিয়ে এসেছেন, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে তাঁরা সক্রিয় হয়েছেন। আজ গাজার বুকে যখন একইরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, নাগরিকদের ওপর ভয়ঙ্কর পাশবিক আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে, হত্যালীলা চলছে, তখন আমরা নিছক দর্শক হয়ে থাকতে পারি না। সম্প্রতি, ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির উদ্যোগে রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশে পাঠানো একটি খোলাচিঠিতে এমনটাই জানিয়েছেন গোটা বিশ্বের বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদরা।

৭ অক্টোবর থেকে পশ্চিম এশিয়ার গাজায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট ইজরায়েলের আক্রমণে চলছে ভয়াবহ ধ্বংসলীলা। প্রতিদিন বোমার আঘাতে নিহত হচ্ছেন শিশু-নারী-বৃদ্ধ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ। নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করা হচ্ছে হাসপাতালগুলিতেও। শুধুমাত্র ৭ থেকে ২৬ অক্টোবর-এর মধ্যে ইজরায়েলি বিমান হানায় গাজায় নিহত হয়েছেন ৬৫০০ মানুষ, যার ৬০ শতাংশ মহিলা এবং শিশু। কার্যত বন্দি, অসহায় একটি জনগোষ্ঠীর ওপর এই সংগঠিত হত্যালীলার প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছেন গোটা বিশ্বের বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীরা। এই বিপর্যয় রোধে রাষ্ট্রসংঘের দৃঢ় হস্তক্ষেপ দাবি করে তাঁরা দাবি করেছেন—অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে প্যালেস্টাইনের ওপর আক্রমণ বন্ধ করতে হবে, যুদ্ধবিধ্বস্ত ভূখণ্ডে প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রীর অবাধ, নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ ও আহতদের চিকিৎসা পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে হবে এবং দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য উপযুক্ত রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষাবিদ সহ ১১০০ জনেরও বেশি মানুষ স্বাক্ষর করেছেন এই চিঠিতে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com